দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২৭ তম সংখ্যা ❖ ১৭ এপ্রিল ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- ঢাকায় নববর্ষ :
  রমনা উদ্যানে বটের মূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যপূর্ণ বর্ষবরণ ২
- এলোমেলো কথা :
  রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ৩
- নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটায় ৪
- পড়া ছেড়ে কাজের খোঁজে, ছাত্রদের নিঃশব্দ পরিযান :
  বাংলার শিক্ষা সংকটের একটি ভয়াল পরিণতি ৬
- এসএসসি'র পুরো প্যানেল বাতিলের
  পথ পরিক্রমা ও প্রভাব ৯
- প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ১২
- নবতর ওয়াকফ আইনের লক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়
  সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার ও তাঁদের সম্পত্তি দখল ১৩
- নেপালে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ফিরে দেখা ১৬
- গাজায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করেছে ইসরাইল ১৭
- উদার গণতন্ত্রের বেলুন চুপসে দিলেন দুই
  মাইক্রোসফট কন্যা ইবতিহাল ও ভানিয়া ১৯
- ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা ২০
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড : সাম্রাজ্যবাদী কলঙ্ক
  ও জনগণের ত্যাগের ইতিবৃত্ত ২১
- ডি. এ মামলা এবং দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে মামলার
  ভূমিকা একটি অনপেক্ষ পর্যালোচনার প্রয়াস ২৩
- মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্ট প্রেস বিবৃতি ২৮

➲সম্পাদকীয়

ধর্মের বিকার .....

নববর্ষের প্রারম্ভে যে সব হিংসাত্মক ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার ধুলিয়ান , সামসেরগঞ্জ , সুতি ' র বিভিন্ন স্থানে ঘটে গেলো তাঅতীব দুঃখজনক। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক প্রশাসনের প্রাথমিক শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তা। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ তার জোরে যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংসদে গ্রহণ করিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে মুসলমান সম্প্রদায় বিরোধী। সমগ্র বিরোধী দলগুলির ও ওই সম্প্রদায়ের কোনও পরামর্শই তাঁরাশোনেন নি। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ ও সেগুলির সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজেদের সমর্থক পুঁজিপতি ও অনুগতদের মধ্যে বিতরণ করা।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সমস্ত ধর্মেরশুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য। সারাদেশেই কংগ্রেসসহ বামপন্থী বিরোধী দলগুলি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। হঠাৎ কিছু ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠন মুর্শিদাবাদ জেলার উপরোক্ত জায়গাগুলিতে বিক্ষোভ মিছিলবের করে নিরীহ মানুষদের ওপর আক্রমণ , দোকানপাট লুট , আগুন লাগানো শুরু করে। দীর্ঘসময় পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। তিনটি অমুল্য প্রাণ চলে যায়। দেশের প্রধান হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটির নেতারা বেশ কিছুদিন ধরে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানোর জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলি তাদের হাতে মেরুকরণ ঘটানোর জন্য ভালোঅস্ত্র তুলে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত ইতিবাচক দিক এটাই যে রাজ্যের আর কোথাও অশান্তি ছড়িযে পরেনি। ঘটনাস্থলে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ও সিপিআই(এম) নেতা মহম্মদ সেলিম গিয়ে জনগণের কাছে যে কোনও মূল্যে বিভাজন রুখবার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ থেকে শতবর্ষ আগে কবিগুরু বলেছিলেন —

'ধর্মের বিকারে গ্রীস মরিয়াছে , ধর্মের বিকারেই রোম লুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ ধর্মের মধ্যেছাড়াআরকোথাও নাই।'

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

Scanned with OKEN Scanner

ঢাকায় নববর্ষ

রমনা উদ্যানে বটের মূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যপূর্ণ বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম : ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, মুক্তচিন্তার নির্ভয় প্রকাশ, আবহমান সংস্কৃতির নির্বিঘ্ন যাত্রা সকলে হৃদয়ে ধারণ করলে, মুক্তির আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতে পৌঁছানো যে সহজ হবে, সেই বার্তাই এল সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের বর্ষবরণে আয়োজনে।

ষাটের দশকে পাকিস্তানিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নগরে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করা সংগঠনটির এবারের নববর্ষ কথনে নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী বলেন, সকল অতৃপ্তি প্রতিবিধানের দায় রাষ্ট্রের, তবে সমাজকেও সে দায় নিতে হয়। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অনুষ্ঠানে এক মিনিট নীরবতাও পালন করে ছায়ানট।

সকলে একসাথে মিলবার, চলবার স্বপ্ন নিয়ে ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে ভৈরবীর রাগালাপে ছায়ানটের ১৪৩২ বঙ্গাব্দবরণের প্রভাতী আয়োজনের সূচনা হয়। রাগ পরিবেশন করেন সুপ্রিয়া দাশ।

রাজধানীর রমনা উদ্যানের বটমূলে সোমবার ছায়ানটের ৫৮তম এ আয়োজন যথারীতি শুরু হয় নতুন বছরের প্রথম দিন ভোর সোয়া ৬টায়। বাঙালি সমাজকে নিয়ে মুক্তির পথযাত্রী হতে এবার ছায়ানটের বর্ষবরণের বার্তা- 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'।

ছায়ানট সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা এবারের আয়োজন নিয়ে আগেই বলেছিলেন, 'বিশ্বব্যাপী যেমন ক্ষয়ে চলেছে মানবতা, তেমনি এদেশেও ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় ঘটছে মূল্যবোধের। তবুও আমরা আশাহত হই না, দিশা হারাই না, স্বপ্ন দেখি হাতে হাত রেখে সকলে একসাথে মিলবার, চলবার।

'বাঙালি জাগবেই, সবাই মিলে সুন্দর দিন কাটানোর সময় ফিরবেই। সার্থক হবেই হবে, মানুষ-দেশ, এ পৃথিবীকে ভালোবেসে চলবার মন্ত্র।' প্রভাতি এই আয়োজনে সম্মেলক কণ্ঠে 'নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা' এবং একক কণ্ঠে দীপ্র নিশান্ত শোনান 'তিমির দুয়ার খোলো'। ৯টি সম্মেলক, ১২টি একক গান ও ৩টি পাঠ পরিবেশন করা হয়। দুই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে দেড়শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে যে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিল ছায়ানট, এখন তা বাঙালির নববর্ষ উদযাপনের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বছর ছাড়া প্রতিটি পহেলা বৈশাখেই সে অনুষ্ঠান হয়েছে; নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়েছে সুরের মূর্ছনা আর কথামালায়। কোভিডের দুবছর এ আয়োজন করা হয় ভার্চুয়ালি।

২০০১ সালে ছায়ানটের বৈশাখ বরণের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালায় জঙ্গিরা। তাতে ১০ জন নিহত হন। এরপর থেকে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই প্রতি বছর বর্ষবরণের এ আয়োজন হচ্ছে।

১৯৬১ সালে পাকিস্তানি শাসকদের বাধা উপেক্ষা করে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপন এবং তার সূত্র ধরে পরে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট গঠনে অনেকের সঙ্গে সনজীদা খাতুন ছিলেন নেতৃস্থানে।

বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কিংবদন্তিতুল্য সনজীদা খাতুন গত ২৫ মার্চ বিকাল ৩টায় জীবনের এই বিপুল যাত্রা সাঙ্গ করেন। এবারই প্রথম সনজীদা খাতুনকে ছাড়া বর্ষবরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করে ছায়ানট। এবার ছায়ানটের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে নববর্ষ কথন পাঠ করে শোনান ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী। তিনি বলেন, 'মুক্তির অন্বেষায়, দীর্ঘ বন্ধুর পথপরিক্রমায় অর্ধশতকবর্ষ পূর্বে, বিপুল আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ওই যাত্রাপথের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতসহ সকল মাধ্যম এবং বিভিন্ন স্থাপনায়।

'বাঙালির স্বাধীকার অর্জনের সংগ্রামে অনন্য মাত্রা যুক্ত করেছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অসাম্প্রদায়িক উৎসব, নতুন বাংলা বছরকে বরণ করার আয়োজন। আমরা এক আলোকিত দেশ ও সমাজের স্বপ্ন দেখি, যে দেশের মানুষ সর্বজনের শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ধর্ম-জাতি-বিত্তের বিভাজন ভাঙবে, গড়বে উদার সম্প্রীতির সহিষ্ণু সমাজ। 'সারওয়ার আলী বলেন, 'বাঙালির মানবতার মুক্তিসাধনা স্বাধীন আপন দেশেও প্রত্যাশা এবং আশাভঙ্গের নানান চড়াই উতরাইয়ের দোলাচল প্রত্যক্ষ করেছে। নববর্ষের ঊষালগ্নে, আজ চোখ ফেলি হিসেব-নিকেশের হালখাতায়। একদিকে মুক্তির জন-আকাঙ্ক্ষা অর্জনের প্রত্যাশা, অন্যদিকে পীড়াদায়ক বিদ্বেষ-বিভক্তি, নারী-শিশুর অমানবিক মর্যাদাহানি ও অপরিণামদর্শী অসহিষ্ণুতা।

'সকল অতৃপ্তি প্রতিবিধানের দায় রাষ্ট্রের, তবে সমাজকেও সে দায় নিতে হয় বৈকি। সকলে ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মুক্তচিন্তার নির্ভয় প্রকাশ, আবহমান সংস্কৃতির নির্বিঘ্ন যাত্রা হৃদয়ে ধারণ করলে, মুক্তির আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুগম হবেই।'

অনুষ্ঠানে সেঁজুতি বড়ুয়ার কণ্ঠে পরিবেশিত হয় একক গান 'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ'; সম্মেলক গান 'তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী', মোস্তাফিজুর রহমান তূর্য'র কণ্ঠে একক গান 'ভেঙেছো দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়', জহিরুল হক খানের কণ্ঠে একক আবৃত্তি 'ঝড়ের খেয়া' (নির্বাচিত অংশ)। সম্মেলক গান 'সকল কলুষতামসহর, জয় হোক', ফারজানা আক্তার পপির কণ্ঠে একক গান 'তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে'; সুমন মজুমদারের কণ্ঠে একক গান 'জগতের নাথ করো পার হে', সম্মেলক গান 'মোরা সত্যের 'পরে মন'; ফারহানা আক্তার শ্যার্লি'র কণ্ঠে একক গান 'আজি নূতন

Scanned with OKEN Scanner

রতনে'; খায়রুল আনাম শাকিলের কণ্ঠে একক গান 'গগনে প্রলয় মেঘের মেলা' পরিবেশিত হয়।

সুমনা বিশ্বাস আবৃত্তি করেন 'দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য', ছোটদের সম্মেলক গানে ছিল 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। এছাড়া লাইসা আহমদ লিসা কণ্ঠে তুলে নেন 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়'।

সম্মেলক গান 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম'; সৈয়দা সনজিদা জোহরা বীথিকার কণ্ঠে একক গান 'ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়'; সুস্মিতা দেবনাথ শুচির কণ্ঠে একক গান 'মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ' পরিবেশিত হয়। সম্মেলক গান 'এই বাংলা রবি ঠাকুরের', আবুল কালাম আজাদের কণ্ঠে একক গান 'এ বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে'; চন্দনা মজুমদারের কণ্ঠে একক গান 'মন সহজে কি সই হবা'; জয়ন্ত রায়ের কণ্ঠে একক আবৃত্তি 'সভ্যতা' (নির্বাচিত অংশ) পরিবেশন করা হয় অনুষ্ঠানে। এছাড়া সম্মেলক গান 'ও আলোর পথযাত্রী' এবং 'আইজ আইলো রে বছর ঘুরি' পরিবেশিত হয়।

সারওয়ার আলীর নববর্ষ কথনের পর সকলে মিলে 'জাতীয় সংগীত' গেয়ে আয়োজনের সমাপ্তি হয়।

এলেমেলো কথা

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

শুভ বসু

আমরা এক পাগল সাম্রাজ্যবাদীর খপ্পরে পড়েছি। কানাডার রপ্তানিকৃত পণ্যর উপরে মার্কিন সরকার শুল্ক চাপিয়েছেন। আমাদের রাষ্ট্র দখল করে নেবার হুমকি দিচ্ছেন। কানাডাও তার ফলে শুল্ক চাপিয়েছে। শুরু হয়ে গেছে বাণিজ্য যুদ্ধ। মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে সরকারি কর্মীদের ব্যাপক ছাঁটাই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর মধ্যে চলছে চাপান উতোর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধর আগের পরিস্থিতিতে পৃথিবী ফেরত চলেছে জোর কদমে। তার কারণ কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব নয় বা চীনও নয়। তার কারণ প্রতীচ্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশ গুলির মধ্যে অভন্তরীণ সংকট। সাম্রাজ্যবাদ বন্দুকের নল ঘুরিয়ে নিজের দিকে তাক করলে কি হয় তা পরিষ্কার প্রথম যুদ্ধ থেকে। এলন মাস্ক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুগল বন্দি কতদূর চলে দেখা যাক।

আবার অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের শৈশবের স্মৃতি চলে এলো মনে। ফাদার পল দ্যতিয়েন এর ২০২৪ সালে শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। ফাদার দ্যতিয়েন ১৯৪৯ সাল থেকে কলকাতায় ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত আসতেন। আমাদের বাড়িতে বহুবার এসেছিলেন। বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। আমাকে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন প্রথম হলো সহজ ছোট বাক্য রচনা করবে আর দ্বিতীয় হলো একই বাক্যে দুটি তৎসম বিশেষণ ব্যবহার করবে না । তাঁর ডাইরির ছেঁড়াপাতা বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এন্থনি বেভিনস। তিনি ছিলেন ব্রিটেনের এক রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। শান্তিনিকেতনে এক বছর ছিলেন ইংরাজীর শিক্ষক হিসাবে। উনি বিয়ে করেছিলেন শান্তিনিকেতনের মেয়ে মিস্টুনি দিকে। এন্থনি দা ছিলেন ব্রিটেনের বিশিষ্ট সাংবাদিক। ১৯৬৭ সালে লিভারপুল পোস্টে চাকরি শুরু করেন এবং ১৯৭৩ সালে তিনি সানডে এক্সপ্রেস যোগদান করেন। পরবর্তী জীবনে ১৯৭৬ সালে তিনি Sun পত্রিকার সাংবাদিক হন এবং সেই একই বছরে তিনি ডেইলি মেইল এ যোগ দেন। ১৯৮১ সালে টাইমস পত্রিকার চিফ করেসপন্ডেন্ট ছিলেন।তিনি ১৯৮৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার রাজনৈতিক বার্তা সম্পাদক হন। আমি যখন ব্রিটেনে ছিলাম তিনি তখন সব থেকে নাম করা সাংবাদিকদের একজন ছিলেন। আমাদের শান্তিনিকেতনে তুলনামূলক ধর্ম শাস্ত্রে আরিয়ানা হাফিংটোন এসেছিলেন পড়তে। এক বৎসর এখানে পড়াশুনো করেছিলেন। তখন কালিদাস ভট্টাচার্য্য বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনের কথা ভোলেন নি। এখন তিনি হাফিংটোন পোস্ট এর বার্তা সম্পাদিকা এবং মূল শক্তি।

আমার বক্তব্য হলো একটা যুগ ছিল যখন প্রথম বিশ্ব থেকে বুদ্ধিজীবীরা গিয়ে তৃতীয় বিশ্বর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতেন।অড্রে ট্রাসচকে থেকে শুরু করে শেলডন পোলক , সিনথিয়া তালবৎ এবং রিচার্ড ইটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ভারতবিদ ঐতিহাসিকরা ভারতের সঙ্গে এবং বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রযুগ থেকে সেই যোগাযোগ ছিল। রবীন্দ্র যুগের অনেকেই আবার বিদেশে গিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনীদের শাখা খুলে ফেলতেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে পড়লে দেখা যাবে কাবুলে রাশিয়ার বোগদানগ্ধথেকে শুরু করে মৌলানা জিয়াউদ্দিন সকলেই শান্তিকেতনের প্রাক্তনীদের একটা শাখা খুলে ফেলেছিলেন। আমাদের মধ্যে তাই একটা বিশ্বর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াস রয়েছে। আমার কেমব্রিজ পড়া কালে ডারউইন কলেজের প্রতিবেশী ছিল একটি কেনিয়ান ছেলে। সে গবেষণা করতো অংকের দর্শন নিয়ে। আমরা তাকে ডাকতাম চিফ এন্থনি বলে। সে আমায় বললো 'তুমি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছো?'

আমি বললাম 'শান্তিনিকেতনের থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে সে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আমায় শুনিয়ে দিলো। আবার ফিলাডেলফিয়াতে আমি গিয়ে ছিলাম এশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে। সেখানে আফগানরা একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। প্রদর্শনীটির নাম ছিল ' কাবুলিওয়ালা।' আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে একটা দুটো কথা বলার পরে তাঁরা আমায় জিগেস করলেন আমি কোথায় পড়াশুনো করেছি ? আমি বললাম -- ' শান্তিনিকেতনে। আমাদের প্রাক্তনী এবং বাংলার মশহুর লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী আফগানিস্তানের উপর ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন।'

Scanned with OKEN Scanner

সমস্ত আফগানদের মধ্যে একটি নীরবতা নেমে এলো। আমি ভাবলাম মারধর দেবে নাকি। পাঠানরা বীরের জাত। কোন কথায় তাদের সংবেদনশীল হৃদয়ের উপর আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আমার সঙ্গের আফগান মেয়েটি এবং সঙ্গী সাথীরা এক সঙ্গে বলে উঠলো আলহাম দুল্লিলা। মাশাল্লা তুমি এশিয়ার চশম এ নূরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারপরে সেই আলিঙ্গন এবং করমর্দন পর্ব চললো। সেখানে ছিলেন পাকিস্তানের ব্রিটেনে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আকবর আহমদ। তিনি আবার ক্যামব্রিজের সেলউইন কলেজের ফেলো ছিলেন নৃতত্ত্ব বিভাগের। তিনি আমায় বললেন ' হিন্দুস্তান পাকিস্তান বাদ দিন ড. বসু। তাগোরে হলেন আমাদের পাঠানদের কাছে ফেরেস্তা। আল্লা তাঁর মতো এতো উমদা শায়ের আমাদের দক্ষিণ এশিয়াতে পাঠিয়েছিলেন তাতেই আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি।'

আজকে পৃথিবীতে চারদিকে পুজিবাদের সংকট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের খেলা চলছে। তার মধ্যে আমাদের এক কবি বিশ্ব এবং ভারতীর মিলনের স্বপ্নে দেখেছিলেন। তাঁর সভ্যতার সংকটে বাঙালির এই কবি বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন। আমি তাঁরই এক একান্ত সাধারণ ছাত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা আমার শৈশবের শিক্ষা।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।)

বজ্রযোগিনী গ্রামে, নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটায়

মিলন দত্ত

'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'

উপন্যাসটা পড়তে পড়তে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়ি যে তার স্থান কাল পাত্র সমেত গোটা কাহিনীটা বিশ্বাস করে ফেলি; যেন এতটুকু কল্পনা কোথাও নেই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল ভাল লাগছিল; বিশেষ করে অতীশ দীপঙ্কর, সূবর্ণদ্বীপ, নালন্দা মহাবিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহার,সর্বোপরি বজ্রযোগিনী গ্রাম আর তার ঘরবাড়ি মানুষজন সমেত অনুপুঙ্খ বিবরণ কেবলই বিশ্বাসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সন্মাত্রানন্দের 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' এমনই এক অদ্ভুত বিমোহিত উপন্যাস। আর সে উপন্যাস কাহিনীর ভিতর দিকে কেবলই যেন টেনে নিয়ে যেতে চায়। তিনটে কালপর্ব যেন ইতিহাসের তিনটি যুগকে এক বিচিত্র বুনোটে একটা আরেকটার ভিতরে প্রবেশ করতে করতে কখনও ভ্রমে কখনও উদ্ভাসের মধ্যে পড়ে পাঠক কাহিনীর অভ্যন্তরে চলাচল করতে থাকে। বাস্তবতার একটা মোহ তৈরি করে। নিবিড় পাঠককে সে আরও পাঠের দিকে অনুসন্ধানের দিকে আরও জানার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়; প্রায় বাধ্য করে। দীর্ঘ দিন ধরে এমনই সব অনুশীলন একটা পর্যায়ে আমাকে অতীশের জন্ম-গ্রাম বজ্রযোগিনীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে।

ওই উপন্যাস পাঠের আগে থেকে খানিক ভ্রামণিকের মন নিয়ে খানেক কৌতুহল নিয়ে বুদ্ধের স্মৃতিজড়িত 'অষ্ট মহাস্থান'-এ বারবার গেছি। বোধগয়া আর লুম্বিনীতে মহাজানি এবং থেরাবাদী শ্রমণদের সঙ্গ লাভের সুযোগ হয়েছে। কিন্তু 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র বারংবার পাঠ ভ্রামণিকের হালকা চলন ঝেড়ে ফেলে নিবিড় অনুসন্ধিৎসার দিকে নিয়ে যায়। তার মধ্যেই ভেবে ফেলি, একবার অন্তত যেতে হবে বজ্রযোগিনী গ্রামে নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটেয়। সেখানে কি অনঙ্গ দাস আর তার কন্যা জাহ্নবীর দেখা মিলবে? গ্রামের স্কুল শিক্ষক আবু তাহের বা তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা কিংবা বৃদ্ধ মোতালেব মিয়াঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে! বজ্রযোগিনী গ্রামে যেখানে পোড়ো রাজবাড়ি, তার নিচে সুড়ঙ্গ সেখানে ঘনিয়ে ওঠে কত না রহস্য। জমি চষতে গিয়ে যে গ্রামে আজও পণ্ডিতের পুঁথি পাওয়া যায়, সেখানে তো যেতেই হবে। কিন্তু বাংলাদেশে তো বললেই যাওয়া যায় না; পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা করিয়ে যেতে হবে সেখানে। নানান কাজে-অকাজে দেরি হতে থাকে। আর বিলম্ব না করে এ বছর একুশের উদযাপন, ঢাকার বইমেলা, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ইত্যাদি নানান ছুতো এক করে রওনা হই বজ্রযোগিনীর উদ্দেশে। ইতিমধ্যে অনেক বদলে গিয়েছে বাংলাদেশ; শেখ হাসিনা-মুক্ত 'স্বাধীন' দেশ চালাচ্ছে তথাকথিত ছাত্র-জনতার মনোনীত সেনাবাহিনী সমর্থিত কয়েকজন উপদেষ্টার অন্তর্বর্তী সরকার। লুটপাট, গণপিটুনি, হত্যা, বিনাবিচারে গ্রেফতার চলছেই। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তা-ঘাটও যথেষ্ট নিরাপদ নেই। সে কথা বিস্তারিত পরে হবে অন্যত্র।

'পণ্ডিতের ভিটায়'

ঢাকা থেকে নারায়নগঞ্জের এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে মুন্সিগঞ্জের ভিতর দিয়ে বজ্রযোগিনী গ্রামে পৌঁছতে গাড়িতে ঘণ্টা দুই লাগে। অতিপ্রাচীন নারায়ণগঞ্জ যাওয়া হয়নি কখনও। এখনও সে শহরে পুরনো বাড়িঘর, বড় বড় পাটের আড়ত আর মশলার বাজার দেখলে বোঝা যায় নারাগঞ্জ আজও বাংলাদেশের অর্থনীতির কতটা ধারন করে রেখেছে। অবশ্য ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ লঞ্চে সময় লাগে আরও কম। নামতে হয় মুন্সিগঞ্জের যোগিনী ঘাটে। কিন্তু দেশের আইনশৃঙ্খলার বেহাল দশা বিবেচনা করে আমার বন্ধু নাহাস আর রূপা তাদের গাড়িতে যেতে প্রায় বাধ্য করলো। অতীশ দীপঙ্করের কথা তাঁর জন্মভিটার কথা ওরা শুনেছে, কিন্তু যাওয়া হয়নি বজ্রযোগিনী গ্রামে। ওদেরও পণ্ডিত ভিটা দেখার সাধ পূর্ণ হল। মুন্সিগঞ্জেরবাজারপেরিয়েভাঙা মোড়থেকেপণ্ডিতের ভিটায়যেতে বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি। গ্রামের লোক সাগ্রহে দেখিয়ে দেন 'পণ্ডিতের ভিটা'র পথ।

পৌঁছে দেখি সেখানে কোনও ভিটা নেই; একটা সোনা রঙের সুউচ্চ স্তূপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পোষাকি নাম 'অতীশ দীপঙ্কর মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স'। ভিটার ঠিক মাঝখানে চমৎকার চীনা স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত অষ্টভুজ সৌধ। শ্বেত পাথরের দুটি সিংহ মূর্তি।

Scanned with OKEN Scanner

অবাক হয়ে জানতে চেয়েছি 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' কোথায়? মোমেরিয়াল কমপ্লেক্সের অধ্যক্ষ তরুণ সন্ন্যাসী ভদন্ত করুনানন্দ থের বললেন, 'ওই স্তূপ তৈরির সময় মাটির নীচে পুরনো যে পাঁচিল বা দেওয়াল পাওয়া গিয়েছিল তার ইটগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরে আমাদের মিউজিয়াম তৈরি হলে সেখানে রাখা হবে।' সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হয়তো কোনও প্রাসাদ ছিল। মাটি চাপা সেই স্থাপনার ওপর স্থানীয় মানুষ যে যার মতো বাড়ি বানিয়েছে। সেখানে আর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করারও সুযোগ নেই।

১৯৫২ সাল থেকে দীপঙ্করের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বৌদ্ধ সংঘের তরফে কিছু উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বজ্রযোগিনী গ্রামে গিয়ে দীপঙ্করের জন্মের হাজার বছর পূর্তি উদযাপন করে। ওই বছরই কিছুটা জমি কেনা হয়। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার পণ্ডিতের ভিটায় দীপঙ্করের জন্মস্থান চিহ্নিত করে একটি স্মৃতি ফলক বসায়। ঢাকার চিনা দূতাবাসের এক তিব্বতি অফিসারের তৎপরতায় ১৯৭৮ সালে তিব্বত থেকে দীপঙ্করের কিছটা চিতাভস্ম ঢাকায় আনা হয়। সেটা রাখা ছিল ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারে। ঢাকায় অতীশ দীপঙ্করের নামে একটা রাস্তাও আছে। পরে ২০১৩ সালে ওই চিতাভস্মের কিছুটা এনে অতীশের জন্মভিটায় প্রতিস্থাপন করে সেখানে স্তূপটি তৈরি হয়; একই সঙ্গে গড়ে ওঠে একটি উপাসনা মন্দির এবং পাঠাগার। বিস্তীর্ণ সবুজের মাঝে পণ্ডিতের ভিটা আজও রীতিমতো আকর্ষণীয়।

বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশ দীপঙ্করের জন্মভিটা কীভাবে ধীরে ধীরে একটা বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে তা সংক্ষেপে বলেছেন সেখানকার অধ্যক্ষ নবীন ভিক্ষু করুনানন্দ থের, 'শ্রীজ্ঞানের জন্ম ভূমি বজ্রযোগিনী গ্রামে ১৯৫২ খ্রিস্টাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্রের একটি দল পরিদর্শন করেন, সঙ্গে ছিলেন ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের তৎকালীন সহকারী কিউরেটর শ্রীগণেশ চক্রবর্তী। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ কর্তৃক ঢাকাস্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার ও অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের বাস্তু ভিটা মুন্সিগঞ্জস্থ (বিক্রমপুর) বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশ দীপংকরের হাজার বছর জন্মপূর্তি উদ্যাপন করা হয়, একই বছরে কিছু জমিও ক্রয় করা হয়। ২০০৬ খ্রিস্টাধে চীন সরকার কর্তৃক অতীশ দীপংকরের জন্ম ভিটা বজ্রযোগিনীতে একটি অতীশ স্মৃতি ফলক নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহামান্য সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো চীনা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশনের সহযোগিতা ও বিভিন্ন দাতাদের সহযোগিতায় জ্ঞানতাপস অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের গৌরবময় কর্ম ও স্মৃতি রক্ষার্থে আরো কিছু জমি কিনে ১৯৭৮ খ্রিস্টাধে চীন দেশ থেকে আনীত বাংলার সত্যসূর্য অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পবিত্র দেহ ভস্ম ঢাকাস্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে সংরক্ষিত দেহভস্ম থেকে কিছু অংশ অতীশ দীপংকরের জন্ম ভিটায় প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে অতীশ স্মৃতি স্তুপ নির্মাণ করার মাধ্যমে অতীশ দীপংকর মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। মহামান্য সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৮ খ্রিস্টাধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুদানের মাধ্যমে অতীশ দীপংকর লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম ভবন প্রথম তলা নির্মিত হয়। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ জ্ঞানতাপস অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের জন্য ভিটায় অতীশ দীপংকর আন্তজার্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা ছাড়াও আরো বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।'

'প্রত্ন-প্রমাণ'

বজ্রযোগিনী গ্রামের খুবই কাছে খনন করে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দুটি বৌদ্ধ বিহার পেয়েছে। একটি বিক্রমপুরী বৌদ্ধবিহার (সেখানেই কি চন্দ্রগর্ভ তথা দীপঙ্করের প্রথম লেখাপড়া, যাকে 'বাজাসন' বলা হয়েছে) আরেকটি নাটেশ্বর বুদ্ধস্তূপ। দুটি জায়গা থেকেই বিভিন্ন আকারের বহু বুদ্ধমূর্তি, তারা দেবীর মূর্তি এবং অন্যান্য প্রত্ন সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। ১৯১২-১৩ শ্রী পরেশনাথের ব্যক্তগত উদ্যোগে এবং ১৯১৬-১৭ সালে ঢাকা সালে ঢাকা যাদুঘরের অধীনে ড. নলিনা ভট্টশালী ওই অৎচলে সীমিত উৎখনন করেন। মাটি চাপা পড়ে থাকা সমৃদ্ধ বজ্রযোগিনার অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও খনন অতীত সমৃদ্ধির সেই ইঙ্গিতই দেয়।

২০১০ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায়, উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকেন্দ্র ঐতিহ্য অন্বেষণের গবেষক দল, জাহাঙ্গীরনগর ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষকশিক্ষিকাবৃন্দ এবং অন্যান্য গবেষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়। এই অঞ্চলে চন্দ্র, বর্মণ ও সেন রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের সুস্পষ্ট লিপিপ্রমাণ রয়েছে। শুরুতে অনুসন্ধান করা প্রত্নস্থানসমূহের মধ্যে সুখবাসপুর, রঘুরামপুর, বজ্রযোগিনী, গুহপাড়া, খানকা প্রভৃতি গ্রামে নয়টি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করা হয়। প্রথম দিকেই উৎখননে স্থাপত্য অবশেষের চিহ্ন হিসেবে ইট, ইটের দেয়াল, পাথরের স্ল্যাব প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, মৃৎপাত্রের টুকরোসহ বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্র, ভাঙা টুকরোসহ পাথরের নিদর্শনের ভেঙে যাওয়া বিভিন্ন টুকরো, কিছু ধাতব নিদর্শন, উদ্ভিজ ও প্রাণিজ অবশেষ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়।

২০১৮-১৯ সালে পরীক্ষামূলক খননে বল্লালবাড়ী থেকে প্রাচীন বসতির প্রমাণাদি পাওয়া যায়। রঘুরামপুরের খননে বিক্রমপুরী বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার এক অনন্য ঘটনা। নাটেশ্বর দেউলে অতীশ দীপঙ্করের সময়ের বৃহৎ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃহৎ ও সমৃদ্ধ স্তূপ কমপ্লেক্স আবিষ্কার বাংলাদেশে এটাই প্রথম। দেশের সর্ববৃহৎ আকারের নান্দনিক কেন্দ্রীয় অষ্টকোনাকৃতি স্তূপের চারদিকে চারটি স্তূপ হলঘরও ছিল। ওই স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি বৃহৎ আকারের অষ্টকোনাকৃতি স্তূপ, স্মারক কুঠুরি,

Scanned with OKEN Scanner

সুরক্ষাপ্রাচীরের অংশ ও নকশা করা ইট। অষ্টকোনাকৃতি স্তূপের কেন্দ্রে বিশেষ ধরনের স্থাপত্য স্মারক কুঠুরিটি দুষ্প্রাপ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার। সেখানে গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শিষ্যের দেহভস্ম ও ব্যবহৃত জিনিস রাখা হতো।

(পরের সংখ্যায় সমাপ্য)

পড়া ছেড়ে কাজের খোঁজে, ছাত্রদের নিঃশব্দ পরিযান : বাংলার শিক্ষা সংকটের একটি ভয়াল পরিণতি

মধুসূদন চ্যাটার্জি

(দ্য ওয়্যার, ২৩ মার্চ, ২০২৫)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা এক সময়ে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু স্কুল ছেড়ে যাবার প্রবণতা, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, শিক্ষকের অভাব, স্কুলের ঝাঁপি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং আর এস এস অধিভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি এগুলির প্রধান কারণ।

প্রথম দৃশ্য : একটি প্রান্তিক ছাত্রের লড়াইয়ের কাহিনী

এ বছরের ৬ই জানুয়ারি শুশুনিয়া হাই স্কুলের সহ শিক্ষক পরেশ হাঁসদা, বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের পাহারভেদিয়া গ্রামে দুলালী মান্ডির বাড়িতে যান। গ্রামটি ছবির মতো আঁকা জেলার একটি পরিচিত পর্যটনস্থল শুশুনিয়া পাহাড়ের পাশেই। দুলালী মান্ডির ছেলে বাপন প্রমোশন পেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে , কিন্তু স্কুলে নতুন ক্লাসে ভর্তি ও মাধ্যমিক স্তরে নাম নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া ২রা জানুয়ারি শুরু হয়ে গেলেও বাপন সেখানে যায় নি। শিক্ষকমশায় দুলালীকে বললেন বাপন যেন এখনই স্কুলে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করে আসে। কিন্তু জবাব পেলেন, 'বাপন বাড়ি নেই। ছয় মাস আগে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে নাম লিখিয়েছে, এখন মাসে ১৫০০০ টাকা বাড়িতে পাঠায়। ও যে পড়াশোনা করলে চাকরি পাবে তার গ্যারান্টি দিতে পারেন ? ও যে বাড়ির জন্য মাসে মাসে ১৫০০০ টাকা পাঠায় তার কি হবে ? আমাদের চলবে কিভাবে ? পড়াশোনা করে ওর কি লাভ' ?

শিক্ষক মশায়ের কাছে এর কোন জবাব নেই। এই প্রতিবেদকের কাছে পরেশবাবু দুঃখ করলেন, 'এক বড় সংখ্যার ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমরা ছাত্রদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে । শিক্ষার ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত' ।

দ্বিতীয় দৃশ্য : একজন সুযোগ হারানো মায়ের সংকল্প

জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলা, বিনপুর ২ নং ব্লক, কোরপুড়া গ্রাম। ২১ বছরের মঙ্গলা বাস্কে, পুষ্টির অভাব তার শরীরের প্রতি অঙ্গে প্রকট, তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে স্থানীয় সমন্বিত শিশু উন্নয়ন সেবাকেন্দ্র (জ্জঙ্খঙ্গ() থেকে ফিরছিল। তার হাতে ছিল ওই কেন্দ্র থেকে পাওয়া এক প্লেট খিচুড়ি ও একটি সিদ্ধ ডিম। মঙ্গলা বললো, '২০২০ সালে কোভিড -১৯ মহামারীতে কোরপুড়া স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, আর খোলে নি। তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি আর হোস্টেলে থাকি। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল, আর বাবা-মা আমায় বিয়ে দিয়ে দিল। আমি পড়াশোনা করতে চাইছিলাম, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না। এখনো আমি পুরোনো ক্লাসঘরের স্বপ্ন দেখিদ।

মঙ্গলা বলে চলে, তসেই সময়ে আমাদের স্কুলের বেশির ভাগ মেয়েদেরই তাড়াহুড়া করে বিয়ে দেওয়া হয়, আর ছেলেরা অন্য রাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যায়। আমার স্বামী মুম্বাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। টাকাপয়সার যত কষ্টই হোক না কেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার মেয়েকে পড়াশোনা করাবই , ওকে যেন আমার মত মাঝপথে পড়া ছাড়তে না হয়দ । কিন্তু মঙ্গলা শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব শঙ্কিত। তকোরপুড়ার ধারে কাছে কোন স্কুল নেই। কাছাকাছি দুটো স্কুল আছে, একটা বালিচুয়া, আর একটা ওদলচুয়া, চার কিলোমিটার দূরে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেখানে আবার শুনেছি মাস্টারদের চাকরি দেয়া নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। এই মাস্টারদের আবার যদি চাকরি থেকে ছাটাই করে দেয় , তবে তো আরও সমস্যাদ।

মৃত্যুমুখী একটি স্কুল ও তার মরিয়া শিক্ষকরা

তিন দিন আগে বাঁকুড়া ১ নং ব্লকের কুমিদ্দ্যা গ্রামের রাধামাধব মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের (ধ্ধ্(জ্ঞ) শিক্ষক রামশঙ্কর পাত্রকে দেখা গেল চল্লিশ ডিগ্রির চাঁদিফাটা গরমে উদ্বিগ্নচিত্তে হনহন করে হেঁটে চলেছেন। সকল সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, একটি ছাত্রও হাজির হয় নি। এই স্কুলে এক সময়ে ছয় জন শিক্ষক ছিল; পঞ্চম থেকে অষ্টমশ্রেণী অবধি ৩০০ ছাত্র পড়াশোনা করত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) ক্ষমতায় আসার পরে কোন নতুন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়নি। পুরোনো শিক্ষকরা অবসর নিয়ে চলে যাচ্ছেন , এখন চারটি ক্লাসে পড়ানোর জন্য মাত্র মাত্র দুজন শিক্ষক পড়ে আছেন। জেলা প্রশাসন জানুয়ারির সাত তারিখে এক নোটিশে একসাথে সাতটি MSK স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তার মধ্যে এই স্কুলটিও আছে।

'এই এলাকায় দারিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের বাস, সবচেয়ে কাছের স্কুল চার কিলোমিটার দূরে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এতদূর যাতায়াত করবে কি করে ? এই কারণেই বামফ্রন্ট সরকার MSK স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। যদি TMC সরকার আরো শিক্ষক নিয়োগ করত তবে এই ছাত্রদের পড়াশোনা চালানো সম্ভব হতো'; রামশঙ্কর পাত্র ও প্রধান

Scanned with OKEN Scanner

শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি আপশোস করছিলেন। করুণ চোখে তারা বললেন, 'দয়া করে কোনোভাবে এই স্কুলটা বাঁচান'। এলাকার বাসিন্দা বুলু দাস মাহাতো ও মৌসুমী পরামানিক ও একই ভাবে চিন্তিত। 'বছরের পর বছর এখানে শিক্ষকের অভাব। এইভাবে কি ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব? অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে'।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হালচাল ১৯৫০-১৯৭০

স্বাধীনতা লাভের সময়ে ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮৪৩১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, মাধ্যমিক স্তরে আনুমানিক ২০০০ টি। দেশভাগের পরে স্থানীয় জমিদার ও শিক্ষাব্রতীদের উদ্যোগে রাজ্যে অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ স্কুলেই পড়াশোনার উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না, বেশিরভাগই চলত মাটির বাড়িতে । 'নিদারুন দারিদ্রের মধ্যে অনেক পরিবারের পক্ষেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব হতো না। হাই স্কুলগুলিতে আবার মাসে মাসে মাইনে দিতে হতো, সেটা দেবার সামর্থ্য ও অনেকের ছিল না। এই মাইনে থেকেই শিক্ষকদের বেতন হতো, সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য', বলছিলেন পুরুলিয়ার গড়জয়পুর হাই স্কুল ও বাঁকুড়ার শালতোড়া তিলুরি হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশীতিপর অকলঙ্ক মাইতি। একই কথা বললেন বিডিআর প্রাথমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বভর দাস এবং আরও কিছু প্রাথমিক শিক্ষক যারা ১৯৬০-৭০ দশকে পড়াতেন । তাঁদের কথায়, সামান্য বেতন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দেওয়া হতো, তাও তিন চার মাস অন্তর অন্তর।

১৯৭৭ সালের পর থেকে বিদ্যালয় শিক্ষার বড় পরিবর্তন

স্কুল শিক্ষার প্রেক্ষাপটে এক বড় পরিবর্তন এলো ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে। সরকারে এসেই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁরা নিলেন, সেটা হলো হাই স্কুলগুলিকে অবৈতনিক করে দেওয়া; ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা আরো ছাড়িয়ে দেওয়া গেল । সেই সাথে, শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হল, তার নিয়মিত বন্টনেরও ব্যবস্থা হল। এইভাবে শিক্ষকদের জীবনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও দূর হল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঘোষণা করলেন, সরকার এখন থেকে শিক্ষকদের বেতন ও একই সাথে মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব নিল। আর এক অশীতিপর শিক্ষক ও বাঁকুড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি জ্ঞানশঙ্কর মিত্রের ভাষায়, সরকার তার কথা রেখেছিল। আবার স্কুলের পাকা বাড়ি গড়ে তোলার জন্য আলাদাভাবে অর্থ সাহায্য দেওয়া শুরু হল, এইভাবে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি হল।

এই সাথে ভূমি সংস্কারের ফলে রাজ্যের গরিব ও প্রান্তিক সমাজের লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হল, হাই স্কুলে ছাত্র সংখ্যাও বাড়লো। সারা ভারত কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার ও পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য নেতা অমিয় পাত্রর মতে, 'ভূমি সংস্কারের ফলে আরো বেশি সংখ্যক পরিবার স্থানীয় এলাকায় নিশ্চিত কাজের সুযোগ পেল; তাদের শিশুরাও স্কুলে যাওয়া শুরু করলদ। যদিও এই সব সংস্কার শিক্ষাকে বিস্তৃত করল, কিন্তু আরও অনেক সমস্যা থেকে গেল। ১৯৯৬ সাল অবধি স্কুলের পরিচালন সমিতিই শিক্ষক নিয়োগ করত, ফলে নিয়োগের অস্বচ্ছতার সুযোগ থেকেই যাচ্ছিল। এটা এড়াতে ১৯৯৬ সালে বাম ফ্রন্ট সরকার স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) চালু করল। তাতে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী প্রার্থীদের স্কুলে চাকরির সুযোগ বাড়ল।

পূর্ব বর্ধমানের ইছলাবাইদ হাই স্কুলের সহ শিক্ষক ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (ABTA) র সভাপতি সুদীপ্ত গুপ্তের মতে, 'সাক্ষরতা মিশন ও এই ধরনের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা কোনোদিন স্কুলে যাবার কথা ভাবতো না, তারাও স্কুলমুখী হতে শুরু করলদ । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী দেশে গড় সাক্ষরতার হার ছিল ৭৩%; পশ্চিমবঙ্গে সেখানে তা ৭৭% এবং ইটা এইসব জনমুখী কর্মসূচির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

গত দশক থেকে নিম্নগামী ছাত্রসংখ্যা

অগ্রগতির চাকা কিন্তু থমকে গেল গত দশকে। ইদানিং কালে পাওয়া উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যার যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা এক অশনি সংকেতের বার্তা দিচ্ছে। গত বছরের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৩৬,৩২৪ জন কমে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী এ বছর ৫,০৯,৫৪৩ জন পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে, যাদের মধ্যে মেয়েরা ৫৫%। গত বছরের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭,৫৫,৩২৪। পর্ষদ এই কমে যাওয়ার পেছনে সরকারি নীতি অনুযায়ী ভর্তির বয়স পাল্টে যাওয়াকে দায়ী করেছে। ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হতে গেলে ন্যুনতম বয়স ছয় বছর হতে হবে বলে নির্দেশ জারি করে। এর ফলে এবার যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তাদের এক বছর পরে ভর্তি হতে হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা জগতের সাথে জড়িত অনেকেই এই ব্যাখ্যার সাথে একমত নন। তাদের যুক্তি, ছাত্রদের পড়া ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতাই পরীক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাবার মূল কারণ।

'২০২৩ সালে ৬,৯৮,৬২৭ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়, উত্তীর্ণ হয় ৫,৬৫,১২০ জন। কিন্তু এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,০৯,৪৪৩। তাহলে এই ৫৬,০০০ ছাত্র গেলো কোথায়'? প্রশ্ন তুললেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (ABTA) র সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন। ছাত্রী সংখ্যা বাড়ার দাবিকেও তিনি খারিজ করে দিলেন। '২০২৩ সালে ৩,২০,০০০ ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়। আর এ বছর মাত্র ২,৭৭,০০০ ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। বাকি ছাত্রীরা গেলো কোথায়? উচ্চ শিক্ষা পর্ষদকে এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে হবে', তাঁর মন্তব্য।

Scanned with OKEN Scanner

স্কুল শিক্ষার ক্রমাবনতি

২০২০ সালের কেন্দ্রীয় শিক্ষা আইন মোতাবেকউধৃঙ্খ শাসিত রাজ্য সরকার বাংলা শিক্ষা পোর্টাল চালু করে। এই আইন অনুযায়ী একজন ছাত্র ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হবার পরে ক্লাস এইট অবধি বছরে বছরে প্রমোশন পেয়ে যাবে, স্কুলে তার হাজিরা থাক বা না থাক। বাঁকুড়া চেতনা চন্ডীদাস বিদ্যামন্দিরের সহ শিক্ষক প্রশান্ত চৌধুরী, পুরুলিয়া জয়পুর হাই স্কুলের চিন্ময় নন্দী আর বাঁকুড়া নতুনগ্রাম প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমান পাত্র -সবাই এক বাক্যে বললেন, ছাত্ররা যাতে নিয়মিত স্কুলে হাজিরা দেয় , তার কোনো উদ্যোগ কোথাও নেই। দু একজন শিক্ষক শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাত্রদের ক্লাসে আনার চেষ্টা করেন। আগে প্রতিটি গ্রামে ভিলেজ এডুকেশন কমিটি (VEC) ছিল, তারা এই সব ব্যাপারে নজরদারি করত; সেগুলি সব তুলে দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ বছর ধরে স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচন হয় নি। তার বদলে সরকার মনোনীত ও শাসক নিয়ন্ত্রিত লোকজন দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যা হওয়ার কথা ছিল আর যা আছে

২০০৯ সালে লাগু হওয়া শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হওয়া উচিত ৩০১। ২০০৮ এ বাংলায় এই অনুপাত ছিল ৩৫১। কিন্তু বর্তমান সংকটকালে এই অনুপাত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০১, জানালেন সুদীপ্ত গুপ্ত। ২০১৮ সালে সরকার অনেকগুলি মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে, বিশেষ করে বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রভর্তি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। বেশ কিছু উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, যেমন বিষ্ণুপুর শিবদাস গার্লস স্কুল , শালতোড়া তিলুরি হাই স্কুল, পাত্রসায়র বাঁকিশোল হাই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছু স্কুলে একজন বা দুজন শিক্ষক নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগ এখনো টিকে আছে, কিন্তু তাতে ল্যাবরেটরি সহায়ক নেই। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকা, যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম জেলায় ছাত্ররা স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব নিয়ে ক্ষুব্ধ। এই পরিকাঠামোর অভাবে এক ব্যাপক সংখ্যার ছাত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

স্কুল উঠে যাওয়ায় ছাত্রদের পড়াশোনায় ইতি

ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি এস সি হাই স্কুলের শুক্লা মজুমদার এবং মুরাদি এস সি হাই স্কুলের কৃষ্ণপ্রাসাদ মান্ডি বললেন, এই জেলার ৩২টি হাই স্কুল শিক্ষকের অভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে এক ব্যাপক অংশের ছাত্র পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। স্থানীয় এলাকায় কাজের সুযোগের অভাবে অনেকেই ভিন্ন রাজ্যে দিনমজুরের কাজের খোঁজে পাড়ি দিয়েছে। আর মেয়েদের মধ্যে একটা বড় অংশকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ঝাড়গ্রামের জয়পুর হাই স্কুলের গুরুপদ নন্দী জানালেন, সরকার বাংলা শিক্ষা পোর্টাল বানিয়েছে , তাতে লেখা হচ্ছে, বলছে ছাত্রদের পড়া ছেড়ে দিচ্ছে না, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অসত্য। বাস্তবে অনেক স্কুলই মুষ্টিমেয় শিক্ষক আর ছাত্র নিয়ে ধুকছে। যেমন, অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত তেলিয়া ভাষা জুনিয়র হাই স্কুল গত ১৪ বছর ধরে চলছে একটি মাত্র শিক্ষক নিয়ে। অপরদিকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পুনিশোল বোর্ড হাই সচ্ছলে ২৬ যান শিক্ষক রয়েছেন ৩০০০ ছাত্রের জন্য। তার ফলে ছাত্ররা সপ্তাহে কিছু নির্দিষ্ট দিনেই ক্লাসে যায়। এগারো ক্লাসের ছাত্র শাকিল আখতার খান বলল, 'যদি ক্লাস সেভেন আর এইটের ছাত্ররা সপ্তাহে দু দিন স্কুলে যায়, অন্যদিন গুলিতে তারা সুযোগ পায় না, কারণ সে জায়গায় অন্য ক্লাস চলছে। ক্লাস নাইনের আর এক ছাত্র আনারুল ইসলাম খান একই মোট ব্যক্ত করল।

এই মুহূর্তে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অবধি শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে রাজ্যে মোট ৩,৯৮,১৫০টি পদ ফাঁকা আছে। বাঁকুড়ার জিলা স্কুল পরিদর্শক পীযূষ বেড়া স্বীকার করলেন যে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম; তবে সেই সাথে যোগ করলেন সরকার পরিস্তিতি মোকাবিলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে শেষ সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি

২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্য ২৬,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে। ২০১৭ সালে ২০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পরে প্রচুর সংখ্যক প্রাথী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তোলে, দাবি করে প্রচুর যোগ্য প্রার্থীকে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট CBI কে এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেয় । CBI তদন্ত করতে গিয়ে এর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতিচক্রের হাদিস পায়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তদানীন্তন শিকক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে ২০ কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বেশ কিছু উচ্চপদস্থ আমলাকেও গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে আছেন প্রাক্তন SSC সভাপতি সুবিরেশ ভট্টাচার্য্য, রাজ্য মধ্যে শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গাঙ্গুলি, শসার উপদেষ্টা শান্তিপ্রাসাদ সিংহ এবং তদানীন্তন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য্য। এদের মধ্যে একমাত্র শেষজন এখন জামিনে মুক্ত, বাকিরা সবাই এখনও জেলে। অনেকের মতে, স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে এটাই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। ফলে ছাত্র ও অভিভাবক, দুই তরফের কাছেই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে।

রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার হাল

রাজ্যে ৬১৪টি মাদ্রাসা আছে, তাতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পদ ফাঁকা আছে ১০,০০০ টি। নতুনগ্রাম হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক

Scanned with OKEN Scanner

আজিজুর রহমানের কথায়, তবহু বাঁচার ধরে নিয়োগ না হাওয়ায় প্রচুর স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর এভাবে ধুঁকছে। আমরা বারবার এব্যাপারে সংখ্যালঘু দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থা নেয় নিদ । দশ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সরকার ১০,০০০ অনুমোদিত মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেবে, বাস্তবে মাত্র ২৩৫টি মাদ্রাসা অনুমোদন পেয়েছে। তিনি আরো বললেন, 'এই সব নতুন অনুমোদিত মাদ্রাসায় ২৩৫০ জন শিক্ষক আছেন। তারা প্রত্যেকে মাসে ৬০০০ টাকা করে ভাতা পান। এই সামান্য ভাতার অনুমোদন পেতেও আমাদের বারবার কলকাতা পুলিশের বর্বরতার মুখে পরতে হয়েছে'।

তালাবন্ধ ছাত্রাবাস

রাজ্যজুড়ে, বিশেষ করে জঙ্গল মহলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একটা বিরাট অংশ গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের ছাত্ররা ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করত। আগে সরকার সোজাসুজি এর খরচা স্কুলের একাউন্টে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু কয়েক বছর হল ব্যবস্থা পাল্টে গেছে, সরকার এখন টাকাটা সোজাসুজি ছাত্রদের একাউন্টে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ত নানাধরণের জটিলতার কারণে বেশিরভাগ হোস্টেলেই এখন বন্ধ হয়ে গেছেদ, জানালেন রানিবাঁধ, বাঁকুড়ার হলুদকানালি স্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম খান। ঝাড়গ্রামের সুখজোড়া হাই স্কুলের শিক্ষক সঞ্জিত পাতর ও একই কথা বললেন। আর এক জন শিক্ষক, পরেশ হাঁসদা জানালেন, একমাত্র বাঁকুড়া জেলায় ২৯০টি ছাত্রাবাসের মধ্যে ১৭৩টি এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

ছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস, RSS সংসৃষ্ট স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি

কন্যাশ্রী প্রকল্প এখন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত প্রকল্প, আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসিত। এতে প্রতিটি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তার ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত বছরে ১০০০ টাকা অনুদান পায় । আর সে যদি ১৮ বছর বয়স অবধি অবিবাহিত থাকে তবে তাকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়। অবশ্য এ বছর বাজেটে কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বছর এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৩৮৪.৫৬ কোটি টাকা, আর এ বছর সেটা কমে হয়েছে ৮১৬.৩১ কোটি টাকা।

ABTA র সুকুমার পাইন বললেন, রাজ্য বাজেট পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কিভাবে ছাত্রীদের সংখ্যা কমছে। তিনি বললেন রাজ্যের শহর ও গ্রামে এমনিতেই কাজের সুযোগ কম। তার উপর বিগত চার বছর ধরে MNREGA র কাজ বন্ধ। কর্মশ্রী প্রকল্প, যা রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে চলার কথা ছিল, এই বছরের বাজেটে একটি টাকাও পায় নি। বাবা মার কাজ নেই, বহু ছাত্রছাত্রী তাই পড়শোনা চালানোর খরচ চালাতে পারছে না।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার বর্তমান হার ১৮.৭৫ । এই রাজ্যে আবার বাল্য বিবাহের হার অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে বেশি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে জঙ্গলমহল এলাকায় বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বেড়েই চলছে, বিশেষ করে যেগুলি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাথে সম্পর্কিত।TMC সরকারও এইসব RSS সংসৃষ্ট স্কুলের অনুমোদন দিয়েই চলেছে। এই ব্যাপারে তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজ্য নেতা ও বাঁকুড়ার হিরাবাঁধ ব্লকের দেউলী হাই স্কুলের শিক্ষক তাপস ব্যানার্জি এবং সেই সাথে ঝিলিমিলি বাঁকুড়ার থেকে আসা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সংস্কৃতি উন্নয়ন পর্ষদের একজন সভ্য দাবি করলেন যে, মহিলারা লক্ষ্মী ভান্ডারের মতো সামাজিক উন্নয়নের তহবিল থেকে ভাতা পেয়ে যাচ্ছে, আর ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাশ্রী বা কন্যাশ্রীর মত প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। তবে তারা স্বীকার করলেন যে ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যাওয়া আর শিক্ষকের অভাব দুইই শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে প্রভাব ফেলেছে। তাঁরা এই সাথে এও বললেন যে বিষয়টি সরকারের গোচরে আনা হয়েছে।

(লেখাটি অনুবাদ করেছেন আইআইটি' র প্রাক্তন অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন।)

এসএসসি'র পুরো প্যানেল বাতিলের পথ পরিক্রমা ও প্রভাব

মজিবুর রহমান

---

২৬ হাজার চাকরিজীবীর প্যানেল বাতিলের রায় ভারতের বিচার বিভাগের ইতিহাসে একটি অন্যতম বিরল ঘটনা। এমন বিরাট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরিচ্যুতির ঘটনা দেশের কোথাও আগে কখনও ঘটেনি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় জনমানসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কোন্ পরিস্থিতিতে পুরো প্যানেল বাতিলের ঘটনা ঘটলো এবং এর অভিঘাত কী হবে সে সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সহকারী শিক্ষক এবং গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বিজ্ঞপ্তিতে নবম-দশমে ১২৯০৫, একাদশ-দ্বাদশে ৫৭১২, গ্রুপ- সি'তে ২০৬৭ এবং গ্রুপ- ডি 'তে ৩৯৫৬ মোট ২৪৬৪০টি পদের উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম পূরণ করেন নবম-দশমে এক লাখ ষাট হাজার, একাদশ-দ্বাদশে এক লাখ কুড়ি হাজার এবং গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি'তে কুড়ি লাখ মোট বাইশ লাখ আশি হাজার। অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন শীটের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নভেম্বর মাসে। লিখিত ৫৫ ও একাডেমিক ৩৫ মোট ৯০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের মে মাস থেকে

Scanned with OKEN Scanner

জুলাই মাসের মধ্যে। প্রতি ১০টি পদের জন্য ১৪ জনকে উত্তীর্ণ করানো হয়। কিন্তু প্রথা ভেঙে প্রাপ্ত নম্বর সহ কোনো সাধারণ তালিকা বা কমন লিস্ট প্রকাশ করা হয়নি। ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয় আগস্ট-নভেম্বরে। চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে। আবারও রীতি ভেঙে প্রাপ্ত নম্বরের উল্লেখ ছাড়াই সফল প্রার্থীদের প্যানেল এবং ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ করা হয়। চারটি বিভাগেই ঘোষিত শূন্যপদের থেকে কম সুপারিশ পত্র কিন্তু বেশি নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়। সুপারিশ পত্রের সংখ্যা কমবেশি তেইশ হাজার আর নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ২৫৭৫৩। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক এবং গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি কর্মীরা নিযুক্ত হন ২০১৮ সালে। ২০১৯ সালে নিযুক্ত হন নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকরা।

২০১৬ এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে জনৈক বৈশাখী ভট্টাচার্য (চ্যাটার্জি) ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম মামলা করেন। নানাবিধ কারচুপি ও নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে ২০১৮-১৯ সালে আরও কয়েকটি মামলা দায়ের হয়। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি ২০১৯ সালের জানুয়ারিতেই রাজপথের আন্দোলনও শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা গণমাধ্যমে 'যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী' হিসেবে পরিচিত হন। অতিমারী করোনার সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পর ২০২১ সালে মামলার সংখ্যা ও আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি নিয়োগ মামলার তদন্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে কমিটি রিপোর্ট জমা দেয় এবং 'প্যান্ডোরাস বক্স' খুলে যায়। রিপোর্টে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নানান ধরনের কারচুপির তথ্য উঠে আসে। কমিটি এগারো জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ করে। অভিযুক্তদের হাজতবাস শুরু হয়। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি অন্তত দশটি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে অসংখ্য অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অনিয়ম করে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়- ওএমআর কারচুপি, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং,প্যানেল-ওয়েটিং লিস্টের বাইরে থেকে নিয়োগ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণপ্যানেলথেকে নিয়োগ। এই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের'অযোগ্য' অথবা 'টেন্টেড' হিসেবে চিহ্নিতকরা হয়। চিহ্নিত অযোগ্যদের সংখ্যা ৮ হাজারের মতো। শতাংশের দিক থেকে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ- সি ও গ্রুপ- ডি'তে যথাক্রমে ৯, ১৫, ৩৯ ও ৪৫ ভাগ অযোগ্য। অবশিষ্ট সতেরো-আঠারো হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি এবং সেই হিসেবে তাঁরা 'যোগ্য' অথবা 'আনটেন্টেড' বলে গণ্য হন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি হল ওএমআর শীট। নিয়ম অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক বছরের মধ্যে এগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে এসএসসি'র দাবি। সেজন্য অরজিনাল ওএমআর শীট পাওয়া সম্ভব নয়। ওএমআর শীটের মিরর ইমেজও রাখা হয়নি। ওএমআর মূল্যায়ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার একজন প্রাক্তন আধিকারিক পবন বনশালের কাছ থেকে তিনটি হার্ডডিস্ক উদ্ধার করা হয়। ওই হার্ডডিস্ক থেকে সমস্ত ওএমআর শীটের স্ক্যান কপি সংগ্রহ করা হয়। এখানে বোঝার সুবিধার্থে বলা দরকার যে, ওএমআর শীট এবং মিরর ইমেজের তথ্য অপরিবর্তনীয় হলেও স্ক্যান কপির তথ্য এডিট করা যায়। এজন্য স্ক্যান কপির তথ্য ততটা গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পবন বনশালের কাছ থেকে পাওয়া স্ক্যান কপিগুলো এসএসসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। সিবিআই স্ক্যান কপিতে উল্লেখিত নম্বরের সাথে এসএসসি'র কম্পিউটারের সফটওয়্যারে থাকা নম্বর মিলিয়ে দেখে। দু'টোর নম্বরের মধ্যে অনেক গরমিল পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্ক্যান কপির নম্বরের থেকে সফটওয়্যারে থাকা নম্বর বেশি। ধরা যাক, একজন প্রার্থীর স্ক্যান কপিতে একটিও প্রশ্নের উত্তর লেখা নেই অর্থাৎ সে সাদা খাতা জমা দিয়েছে। এক্ষেত্রে তার শূন্য নম্বর পাওয়ার কথা কিন্তু সফটওয়্যারে হয়তো তার নম্বর আছে পঞ্চাশ বা পঁয়তাল্লিশ বা সাতচল্লিশ ইত্যাদি। স্ক্যান কপির নম্বরকে 'যোগ্য' চাকরিজীবীরা স্বীকার করলেও 'অযোগ্য' চাকরিজীবীরা অস্বীকার করেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওএমআর মূল্যায়নের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়ম করা হয়। গোপন টেন্ডারের মাধ্যমে নাইসা বলে একটা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু নাইসার বদলে কাজ করে স্ক্যান টেক নামের অন্য একটা সংস্থা।

২০২২ সালের মে মাসে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৬ হাজার সুপারনিউমেরারি পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সংখ্যাটা 'অযোগ্য' চাকরিজীবী অথবা 'যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী'দের সমান। অর্থাৎ, যোগ্য বঞ্চিতদের চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি অযোগ্যদেরও চাকরিতে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সুপারনিউমেরারি পদে অবশ্য কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত হতে পারেননি। হাইকোর্ট সরকারের এই উদ্যোগকে অবৈধ ঘোষণা করে। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির নির্দেশে প্রায় ৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরিচ্যুত হন। দুই-তিন মাস বেতন বন্ধ থাকে। ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের পুনর্বহাল করে। নিয়োগ মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। শীর্ষ আদালত ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে নিয়োগ দুর্নীতির যাবতীয় মামলার বিচার করার নির্দেশ দেয়। সেই মতো ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বির রশিদির বিশেষ বেঞ্চে শুনানি শুরু হয়। ২২শে এপ্রিল রায় ঘোষণা করা হয়। পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে নিয়োগ পত্র পাওয়া ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকে। বাদবাকি ২৫৭৫২ জনের চাকরি চলে যায়। 'অযোগ্য' চাকরিজীবীদের বারো শতাংশ সুদ সহ সমস্ত বেতন ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৪শে এপ্রিল সুপ্রিম

Scanned with OKEN Scanner

কোর্ট প্যানেল বাতিল ও বেতন ফেরানোর নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। ২০২৫ সালের ৩রা এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ বহাল রাখে। 'যোগ্য'দের মধ্যে যাঁরা অন্য কোনো সরকারি চাকরি ছেড়ে এসেছেন শুধুমাত্র তাঁরা পুরনো পদে ফিরে যাবার সুযোগ পাবেন।

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়েই যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করার জন্য এসএসসি, বোর্ড বা সরকারের প্রতি বারংবার আহ্বান জানায়। তারা 'যোগ্য চাকরিজীবী' ও 'অযোগ্য চাকরিজীবী' শিরোনামে দুটি সুনির্দিষ্ট তালিকা পেতে চায়। কিন্তু কেউই সেই তালিকা দেয়নি এবং যোগ্যদের মধ্যে অযোগ্য থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা জোর দিয়ে নাকচ করেনি। অর্থাৎ, 'চাল-কাঁকড়' আলাদা করা হয়েছে, এই মর্মে হলফনামা দেওয়া থেকে সরকার পক্ষ বিরত থেকেছে। এমতাবস্থায়, আদালত পুরো প্যানেল বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাঁকড়যুক্ত চাল খেয়ে পেট খারাপ করার থেকে তা না খেয়ে অভুক্ত থাকার নিদান দিয়েছে।

যোগ্য-অযোগ্য নিরূপণ করার ব্যাপারে সরকার পক্ষ মোটেই আন্তরিক নয়- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারা চেয়েছে যোগ্যদের ঢাল করে অযোগ্যদের পার করে দিতে। যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণকে আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং ডকুমেন্টের অভাবও রয়েছে। সচেতনভাবেই নথি নষ্ট করা হয়েছে।

আদালত যে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু চাকরীজীবীকে 'অযোগ্য' বলছে এবং তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে সেই মানদণ্ডেই অবশিষ্টদের 'যোগ্য' বিবেচনা করে চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হত বলে মনে হয় না। কাউকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা কি খুব জরুরি? যাঁরা অযোগ্য প্রমাণিত হয়নি তাঁদেরকে যোগ্য বলে মেনে নিতে এত আপত্তি কেন? তাঁরা কেন 'বেনিফিট অব ডাউট' পাবেন না? আদালত কি যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করার জন্য একটা কমিটি গঠন করতে পারত না।

'অযোগ্য' চাকরিহারাদের সুদ সহ বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন হবে। একাদশ-দ্বাদশ ও নবম- দশমের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ওই অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ত্রিশ লাখ ও চল্লিশ লাখ টাকার বেশি। ক'জনের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে? তাঁরা তো গাড়ি-বাড়ি কেনার জন্য ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে বহু টাকা ঋণ নিয়ে বসে আছেন! বেতনের টাকা থেকেই কিস্তি কাটা হয়। তাহলে কি এবার অনাদায়ে হাজতবাস নাকি হতাশায় আত্মহনন!

এমনিতেই জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্নীতিপ্রবণ। দুর্নীতির একটা সামাজিকীকরণ ঘটে গেছে। তার উপর সরকার বা প্রশাসন যদি দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় তখন আর কারোর কিছু করার থাকে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। খুব কমজনই পারে দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ না করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে। ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত যুব সমাজের জন্য দুঃসময় শুরু হয়। চতুর্দিকে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার, বিদ্যালয় সহ সমস্ত সরকারি বিভাগে প্রচুর সংখ্যক শূন্যপদ অথচ কোনো নিয়োগ নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নিয়োগ হয় কিন্তু নিয়ম মানা হয় না। একাডেমিক রেজাল্ট, চাকরির পরীক্ষার ফল, ইন্টারভিউয়ের পারফরম্যান্স- এসবের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। নেতা-মন্ত্রী আর আমলা-আধিকারিকরা চাকরি বিক্রির দোকান খোলেন। লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হতে থাকে। সর্বত্র কাটমানি, কমিশন, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি চলতে থাকে। এই নজিরবিহীন নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কোথাও তেমন তীব্র প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রদর্শিত হতে দেখা যায় না। সবাই চাক্ষুষ করে রাজা উলঙ্গ কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করে না- 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' এরকম একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বসে থাকা লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী মনে করতে থাকেন, সৎ পথে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ওই চাকরিকেই তাঁরা পাখির চোখ করেন। এঁদের একাংশ তখন গয়না গাঁটি, জমিজমা বিক্রি করে ঘুষের টাকা যোগাড় করেন। তাঁদের নৈতিক বিচ্যুতি ঘটে। তাঁরা দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে যান। সিস্টেমের শিকার হন। পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় তাঁরা যে ভুল করেছেন এখন তার খেসারত দিচ্ছেন। যেসকল চাকরিপ্রার্থী সাদা খাতা জমা দিয়েছেন তাঁরা কিছুই লিখতে পারেননি বলে লেখেননি, ব্যাপারটি এমন নয়। আসলে তাঁরা জানা-অজানা কোনো প্রশ্নেরই উত্তর লেখার চেষ্টা করেননি। কারণ, এজেন্টদের সঙ্গে তেমনই কথা হয়েছিল। চাকরি বিক্রির বাজারে যাঁরা আসল এজেন্ট ধরেছেন এবং চুক্তি মোতাবেক 'পেমেন্ট' করেছেন তাঁদের চাকরি হয়েছে। নকল এজেন্টের হাতে টাকা দিয়ে চাকরি না পেয়ে অনেকেই প্রতারিত হয়েছেন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ কর্মপ্রার্থী নিজেদেরকে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত করেননি। এটাকে একটা ইতিবাচক ঘটনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে সৎভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরাও বরখাস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ সততার মূল্য থাকছে না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

একসঙ্গে এতজন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরিচ্যুত হওয়ার ফলে স্কুলগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। এখন আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। স্কুল ফান্ড থেকে যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক আছেন তাঁদেরও প্রায় অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ বিদায় নিলে স্কুলগুলো চলবে কীভাবে! নতুন নিয়োগের ব্যাপারে কোর্টের কোনো কড়া নির্দেশ নেই, কিন্তু বাতিলের বেলায় বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে!

Scanned with OKEN Scanner

পুরো প্যানেল বাতিলের ফলে 'যোগ্য' চাকরিহারা, 'অযোগ্য' চাকরিহারা, 'যোগ্য বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী' সবারই ক্ষতি হল। বিপর্যয় ঘনীভূত হল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায়। লাভ হল সরকারের। বেতন বাবদ খরচ বাঁচল। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের বিমুখতা বৃদ্ধি পেল। শিক্ষার বেসরকারিকরণ সম্প্রসারিত হল।

(লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।)

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া

প্রভাত পট্টনায়েক

বিদেশ থেকে মার্কিন মুলুকে আমদানি করা পণ্যের ওপরে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে বলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তখতে বসেই যে ঘোষণা করেছেন, তাতে দুনিয়া জুড়ে বেশ হইচই পড়ে গিয়েছে। মেক্সিকো, কানাডা, কলম্বিয়ার মতো দেশগুলির সাথে ট্রাম্পের লক্ষ্য ভারতও। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অহোরাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর 'গভীর' বন্ধুত্বের কথা চতুর্মুখে বলে বেড়ালেও ট্রাম্প কিন্তু ভারতকে তার টার্গেট লিস্ট থেকে ছাড় দেননি। কানাডা, মেক্সিকো, কলম্বিয়ার মতো দেশের রাষ্ট্রনায়করা যখন পালটা হুমকি দিয়ে মার্কিন পণ্যের ওপরে শাস্তিমূলক শুল্ক বসানোর কথা শুনিয়ে রেখেছে, সেই সময়ে আমাদের ছাপ্পান্ন ইঞ্চি আগ বাড়িয়ে ট্রাম্পকে খুশি করার জন্য ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে আমদানি করা অনেক পণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক নিজেরা যেচে কমিয়ে দিয়েছে অথবা দেওয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করার কথা জানিয়ে রেখেছে। এর পরেও ট্রাম্পের ভবি ভোলবার নয়।

বাড়তি শুল্ক চাপানো নিয়ে দুনিয়ায় হইচই শুরু হলেও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি কিন্তু দুনিয়ার বিশেষ নজর নেই। উঁচু হারে আমদানি শুল্ক বসালে দেশের অভ্যন্তরের উৎপাদকদের দেশের বাজারের ওপরে দখল জমাতে সুবিধে হয় সন্দেহ নেই। উঁচু শুল্ক চাপানোর সাথে সাথে যদি কেবল দেশীয় উৎপাদকদের বাজারের ওপরে দখল বাড়ানো শুধু নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেরও প্রসার ঘটানো যায়, তাহলে অধিক শুল্কের কারণে বিদেশী পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে এমনটা বলা যায় না। কিন্তু একই সঙ্গে যদি দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার না ঘটে তবে এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, বিদেশী পণ্যের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

তাহলে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার ঘটানোর উপায় কী? এতদিনে একথাটা সকলেই জানে যে, সরকারি ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হলে অভ্যন্তরীণ বাজারেরও প্রসার ঘটবে। এখন প্রশ্ন হল, এই অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহ করার জন্য সরকার টাকা পাবে কোথা থেকে? এই কথাও আজকাল সকলেই জানে যে, সরকার এই অতিরিক্ত টাকা পেতে পারে দুটি উৎস থেকে; হয় বাজেটে আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি করে অথবা ধনীদের ওপরে অতিরিক্ত করভার চাপিয়ে। প্রথম উপায় অবলম্বন মারফৎ অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি ঘটানো হলে সমাজের কোনও অংশের ওপরেই কোনওরূপ অতিরিক্ত কর আরোপের প্রয়োজন হবে না এবং ফলতঃ, কারোরই ভোগব্যয় কাটছাঁট করার প্রয়োজন পড়বে না। তার ফলে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির গোটাটাই মোট চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাজারের প্রসার ঘটাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যদি ধনীদের ওপরে কর চাপিয়ে বর্ধিত সরকারি ব্যয়ের অর্থের সংস্থান করা হয়, তাহলে ব্যাপারটা কী ঘটে? ধনীরা কমপক্ষে তাদের আয়ের অর্ধেক সঞ্চয় করে। ধরা যাক বর্ধিত সরকারি ব্যয়ের অর্থের সংস্থান করার জন্য ধনীদের ওপরে ১০০ টাকা হারে বর্ধিত কর চাপানো হল। এই ১০০ টাকার পুরোটাই বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি করে। এই বর্ধিত করের দরুণ উক্ত ধনীর ভোগ-ব্যয়ের, ধরা যাক, ৫০ টাকা কাটছাঁট করতে হল এবং বাকি ৫০ টাকা তার কম সঞ্চয় হল। এই ১০০ টাকা সরকার চাহিদা সৃষ্টি জন্য যখন খরচ করে, তখন নীট চাহিদা বাড়ে ৫০ টাকার। অর্থাৎ বাজারের প্রসার ঘটে ৫০ টাকার। সেটাই বা কম কী? গরীবদের ওপরে কর চাপালে হিতে বিপরীত হবে। গরীবরা যেহেতু যা আয় করে তার পুরোটাই গ্রাসাচ্ছাদনে ব্যয় করতে হয়, তাই তাদের ওপরে বর্ধিত করভার চাপালে বাজারের প্রসার ঘটা তো দুরের কথা, তাদের বিদ্যমান চাহিদারই সঙ্কোচন ঘটে। পরোক্ষ কর বাড়ালেও একই দশা হয়। বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ বাজারের কোনও বিস্তার ঘটে না।

এই নিবন্ধের গোড়াতেই আমরা বলেছিলাম যে প্রায় গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ ঘোষণার আনুষঙ্গিক আর একটি বিষয় নিয়ে দুনিয়ার কর্তারা নিশ্চুপ রয়েছেন। সেটা হল এই যে, ট্রাম্পের এই জেহাদের পরিপূরক হিসেবে মার্কিন মুলুকের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে আলোচিত দুটি উপায়ের কোনও একটি অবলম্বন করে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির কোনও পরিকল্পনা ঘোষিত হয়নি। আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধির করার কোনও ইচ্ছে ট্রাম্প সাহেবের নেই। যদি তিনি সত্যিই কিছু চান, তা হ'ল কীভাবে ধনীদের কর আরও কমানো যায়। সুতরাং, তাঁর ঘোষিত শুল্ক-যুদ্ধের মোদ্দা কথাটি হচ্ছে বিদেশি পণ্যের ওপরে বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপিয়ে কীভাবে বিদ্যমান আমদানির পরিমাণ কমানো যায়। আমেরিকার বাণিজ্য-সহযোগীরা যদি ট্রাম্পের এই ঔদ্ধত্যের মাশুল হিসেবে হ্রাসপ্রাপ্ত রপ্তানির শিকার হয়, তা'হলে তারা তাদের নিজ দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় উপরে বর্ণিত দু'টি পদ্ধতির যে কোনও একটি অবলম্বন করে কর্ম সংস্থানের সংকোচন রোধ করতে পারে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের চলতি মাত্রা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল প্রতিটি দেশকে আন্তর্জাতিক পুঁজির আদেশ অনুসারে নিজ নিজ আইন সভায় চট্টঙ্কঞআইন পাশ করাতে হয়েছে। এই আইন অনুসারে কোনও দেশই তার জিডিপির একটা নির্দিষ্ট শতাংশের বেশি আর্থিক ঘাটতি পাশ করাতে পারবে না। পুঁজির আশঙ্কা, মাত্রাছাড়া আর্থিক ঘাটতির অনুমতি দিলে মুদ্রাস্ফীতিও লাগাম ছাড়া হবে।

Scanned with OKEN Scanner

সুতরাং, কোনও দেশ আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির হুকুম মত চলতে না চাইলে সে দেশ থেকে একযোগে লগ্নি প্রত্যাহার করবে। ফলে সেই দেশ নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হবে। সুতরাং যে সব দেশ আমেরিকার সাথে বাণিজ্য করে, তারা কর্মসঙ্কোচন সৃষ্টিকারী মার্কিন সংরক্ষণবাদের ফাঁদে পড়লে অন্য কোনও উপায়ে নিজেদের দেশে মোট চাহিদা বৃদ্ধি করে বেকারত্বকে যে মাথাচাড়া দিতে দেবে না, তার কোনও উপায় নেই। ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধের নিহিতার্থ হ'ল আমেরিকার বেকারত্ব অন্য দেশে রপ্তানি করা। একেই বলে beggar thy neighbour policy (আমার প্রতিবেশি ভিখারী হোক নীতি)।

ভারত সহ আমেরিকার বাণিজ্য সহযোগীরা ট্রাম্পের পাল্টা নিজেরাও মার্কিন পণ্যের বিরুদ্ধে শুল্ক-সংরক্ষণের দেওয়াল তুলতে পারে। এভাবে দুনিয়া জুড়ে শুল্ক-যুদ্ধ শুরু হলে অচিরেই তা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হবে, অর্থাৎ কোন দেশেরই লাভ হবে না। ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়ে যখন বৃটিশ পাউন্ডের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো তখন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু যেমনটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সকলেই লাভবান হতে চাইছিল।

আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে একটু অন্য ভাবে দেখা যায়। যদি আমরা দুনিয়ার পুঁজিবাদকে একটি অখন্ড সত্তা হিসেবে কল্পনা করি, কারণ পুঁজি এখানে তুলনামূলক স্বাধীনভাবে তাদের গতিবিধি অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে এই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সমস্ত জাতি-রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির পদতলে এমন ক্রীতদাসত্বের দাসখৎ লিখে দিয়েছে যে তারা নিজের দেশের সীমানার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নেবে, সেই পথও খোলা নেই। ফলে গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মোট চাহিদার বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। একটিমাত্র দেশ, তার হীনতম স্বার্থবুদ্ধি-সঞ্জাত বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণের জেরে দুনিয়ার এক বৃহৎ অংশের মোট চাহিদা ছিনিয়ে নিয়ে নিতে চাইছে। একটি মাত্র দেশের এই খোলাখুলি দস্যুতা কেবলমাত্র তখনই সফল হতে পারে যদি অন্য দেশগুলি প্রত্যাঘাত না করে। অদৃষ্টের পরিহাস এটাই যে, প্রত্যাঘাত করলেও আগের মতই বেকারত্বের পঙ্কিল আবর্তে তারা ঘুরপাক খেতেই থাকবে।

কোন অর্থেই এবং কারও স্বার্থেই ট্রাম্পের এই শুল্ক-যুদ্ধ কোনও অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না। আমেরিকার বাণিজ্য সহযোগী দেশগুলি যদি প্রত্যাঘাত না করে তবে আমেরিকা হয়তো নতুন কর্মসংস্থানের মুখ দেখতে পারে। যদিও তা অন্যান্য দেশের কর্ম সংকোচনের মূল্যে। কিন্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি ফোঁস ক'রে উঠে পালটা প্রত্যাঘাত করে, তাহলে কোন পক্ষেরই কোন লাভ হবে না। বরং তারা সমবেত ভাবে বৃহত্তর কর্ম সংকোচনের মুখোমুখি হবে। ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের সমস্যা হচ্ছে ,নেহাতই আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। এই ঘটনা ঘটছে এমন এক পরিমণ্ডলে যেখানে লগ্নী পুঁজির অবাধ গতিবিধির ওপরে কোনও বাধা নিষেধ নেই। নয়া উদারবাদী জমানার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পুঁজির অবাধ গতিবিধির ওপরে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা চলবে না। ট্রাম্প তেমন কাজ যে কখনই করবে না সেটা বলাই বাহুল্য।

পুনশ্চ- এই নিবন্ধ রচনা শেষ হওয়ার আগেই আমেরিকা তাদের প্রায় সমস্ত ট্রেডিং পার্টনারের ওপরে নতুন বর্ধিত আমদানি শুল্ক ঘোষণা করেছে। চীন, ইওরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা প্রভৃতি দেশ উপযুক্ত পালটা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে। ভারত নিশ্চুপ।

সূত্র দ্য টেলিগ্রাফ

ভাষান্তর নন্দন রায়

প্রকাশের তারিখ ১১-এপ্রিল-২০২৫

নবতর ওয়াকফ আইনের লক্ষ
মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার ও
তাঁদের সম্পত্তি দখল

অমিতাভ সিংহ

গত ২ রা এপ্রিল ওয়াকফ বিলটি পাস করানোর বিষয়টি ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে অতীব দুর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয় ঘটনা। এই আইনটিতে বর্তমান বিজেপি সরকার যে সব ধারা যোগ করেছে তা দেশের গণতন্ত্রের বেশ কিছু রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে করা হয়েছে।

২০০৫ সালে ইউপিএ সরকার গঠিত ' রাজেন্দ্র সাচার ' কমিটি মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করে পরের বছর একটি রিপোর্টে ওয়াকফের অন্তর্গত সম্পত্তির পরিচালনা ও তার আয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। সুতরাং সংস্কারের জন্য একটা পরিকল্পনা যে প্রয়োজন ছিল তা নিয়ে দ্বিমত নেই। সেইজন্য ইউপিএ সরকার ২০১৩ সালে এই আইনে কিছু সংশোধনী আনে যাতে সংসদের উভয়কক্ষে বিজেপি সমর্থন দিয়েছিল।কিন্তু এবার বিজেপি পরিচালিত সরকার যেভাবে একপেশে ও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই বিলকে আইনে পরিণত করল তা কোনও গণতান্ত্রিক দেশের দস্তুর হওয়া উচিত নয়। দেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বিষয় নিয়ে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করা হল যখন শাসক দলের সংসদের দুই কক্ষের কোনও একটিতেও একজনও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নেই। এর মধ্যে সংখ্যাগুরুবাদের আস্ফালন ও রক্তচক্ষু মানসিকতা যে প্রবলতর তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। ইনক্লুসিভিটি বা সকলকে নিয়ে চলার কথা ফলাও করে প্রচার করে বিজেপি যাদের বিষয়ে এই আইন সেই তাদের মতামতকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে।

বিজেপির শরিক দলগুলির অবস্থা আরও করুণ। জেডিইই বা টিডিপি বিনা বাক্যব্যয়ে বিজেপির কতৃত্ব মেনে নিয়েছে। জেডিইউ এর একাধিক নেতা এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। বিহারের

Scanned with OKEN Scanner

আগামী নির্বাচনে সংখ্যালঘু সমাজ তাদের কতটা সমর্থন করবে তা নিয়ে পাল্টিবাজ নীতিশকুমার যে বিশেষভাবে চিন্তিত তার আভাষ পাওয়া গেছে। আসলে বিজেপি তাদের যেমনভাবে নাচাবে তারা তেমনিভাবেই নাচবে। ক্ষমতায় থাকার কি প্রবল বাসনা!

মূল বিষয়ে আলোচনা করার আগে একটু দেখে নেওয়া যাক ওয়াকফ আসলে কি। ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে কেউ কোন সম্পত্তি চিরকালের জন্য দান করলে তাকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে। এই সম্পত্তি মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, স্কুল, লাইব্রেরী, হাসপাতাল ইত্যাদির মত ধর্মীয় বা জনকল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হয়। ওয়াকফ তহবিল থেকে ইমাম,মোয়াজ্জিনদের ভাতা, দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের স্কলারশিপ, পীড়িত ও প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা করা যায়। বিভিন্ন সময়ে মুসলীম সম্রাট, সুলতান, নবাব, জমিদার,ধনী এমনকি সাধারণ মুসলীমও তাঁদের সম্পত্তি দান করেছেন। হুগলী মহসীন কলেজ বা ইসলামিয়া হাসপাতালের মত অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। এমনকি জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় ওয়াকফ দান ছিল যদিও এখন কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বহন করে। স্বাভাবিকভাবে সারা ভারত জুড়ে বিশাল পরিমাণে ও মূল্যের ওয়াকফ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে যা বিশ্বের কোন দেশে নেই। এর ওপর বিজেপি সরকারের নজর পড়েছে।

ব্রিটিশদের তৈরী করা নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের সংগঠনের যেসব সম্পত্তি রয়েছে তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণার দায়িত্ব সেই ধর্মের লোকজনকে নিয়ে তৈরী ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। হিন্দু সমাজে দেবোত্তর সম্পত্তির কথা আমরা সবাই জানি। একই রকমভাবে শিখদের জন্য আছে শিখ গুরুদ্বার আইন ১৯২৫। ঠিক যেমন রয়েছে ওয়াকফ আইন ১৯৫৪। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য স্তরে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। জেলা পর্যায়েও ওয়াকফ কমিটি রয়েছে। ইউপিএ সরকারের সময় ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হয় যাতে ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ হলে তা নিস্পত্তি করার জন্য ট্রাইব্যুনালের কথা উল্লেখ করা হয়। ২০১৩ সালে এই আইনে সংক্ষিপ্ত সংশোধন করা হয়।প্রতিটি আইন বা সংশোধনীকে দেশের সংখ্যালঘু সমাজ স্বাগত জানিয়েছিল।

এইবার ২০২৪ সালে যে বিল বিজেপি সরকার এনেছে তাতে ৪৪টি সংশোধনী এনে এই বিলের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে মুসলীম সমাজ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ এই আইনটির উদ্দেশ্য হল মুসলীম সমাজের জন্য দান, যা ব্যবহৃত হয় তাদের উন্নতির জন্য , পেছনের দরজা দিয়ে তা আত্মসাৎ করা। যাতে তারা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতে না পারে ও আর্থিকভাবে অসুবিধায় পড়ে।

১৯৯৫ সালের আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সভাপতি হন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী। বাকী সদস্যদের মুসলীম হতে হয়। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। কিন্তু এবারের আইনে বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অমুসলিম রাখার সংস্থান করা হয়েছে। অথচ শিখ গুরুদ্বার আইন বা দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই থাকেন। কেন মুসলীমদের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হবে? সি.এ.এ বা এন.আর.সি এর ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখা গিয়েছিল। যেন একটি সম্প্রদায়কে দেশ থেকে তাড়ানো এই সরকারের প্রধান কাজ। তা সম্ভব না হলে তাদের ওপর যতরকম সম্ভব দমনপীড়ন চালিয়ে যাও যাতে তারা নিজে থেকেই দেশ ছেড়ে পালায় অথবা তাদের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে চিরকাল একটা দূর্বল সম্প্রদায় হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে থেকে যায়। মনে পড়ে ১৯৪৭ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশ ছাড়তে চাওয়া মুসলীমদের উদ্দেশ্যে জামা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমরা কেন এদেশ ছাড়বে? এদেশ তোমাদেরও দেশ। এই দেশের স্বাধীনতার জন্য তোমরা অনেক সংগ্রাম করেছ, তোমাদের পূর্বপুরুষদের কবর এখানেই আছে। তাই বলছি তোমরা নিজেদের এই দেশ ছেড়ে যেও না। এর পরেই তারা নিজেদের জিনিসপত্র নামিয়ে রাখে ও এইদেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই আইনে ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালে মুসলীম আইন বিশেষজ্ঞর অন্তর্ভুক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। আগেকার আইন অনুযায়ী কাউন্সিল বা বোর্ডে সদস্যরা কিছু নির্বাচিত ও কিছু মনোনীত হতেন। সাংসদ, সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতি, সিভিল সার্ভেন্ট, সরকারি আধিকারিকেরা থাকতেন ট্রাইবুন্যালে। তাহলে কি তারা কোনও ভুল বা অনৈতিক কাজ করেছিলেন যে এই ব্যবস্থার পুরো খোলনলচে বদলাতে হবে?

এখনকার আইন অনুযায়ী পুরোটাই সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। হিন্দু এনডাওমেন্ট অ্যাক্ট এর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। ওয়াকফে দান করা হয় ভগবানের নামে যা কখনওই ফেরত নেওয়া যায় না কারণ এটা থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা হয়। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে তাদের সংখ্যালঘু করে দেওয়া শুধু প্রথা বিরোধী নয়, অনৈতিকও বটে। আসলে বিজেপি সরকারের পদক্ষেপ সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দিক থেকে নেওয়া যা চূড়ান্ত পক্ষপাতদুষ্ট।

১৯৯৫ সালের আইন ওয়াকফ সম্পত্তি অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিয়েছিল। এর ফলে তা অন্যকাজে লাগানো বা বিক্রি করা যেত না। ২০২৫ সালের আইনে তা তুলে দেওয়া হল। 'ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট এফিসিয়ান্সী এন্ড ডেভলপমেন্ট অ্যক্ট' বা UMEED এ দাবী করা হচ্ছে যে এটা একটি প্রশাসনিক সংস্থা যা গঠিত হচ্ছে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিয়ে আসা। সংশোধনগুলোর প্রধান কয়েকটি তুলে ধরলাম---

ছয়মাসের মধ্যে ডিজিটাল নথিভুক্তিকরণ। বেশীরভাগ সম্পত্তি বহু পুরানো ওয়াকফ। ফলে কে কবে কাকে দান করে গিয়েছিল তার নথি এখন পাওয়া দুঃসাধ্য। ফলে এগুলি সরকার সহজেই গ্রাস করতে পারবে।

Scanned with OKEN Scanner

মালিকানা নিয়ে বিবাদ থাকলে তা সমাধানকরার অধিকাব ওয়াকফ ট্রাইবুন্যালের বদলে সরকারি আধিকারিকদের। তারা কি সরকারের ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রেখে পক্ষপাত শূণ্য হতে পারবে?

অমুসলিমরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্য হতে পারবে। এর অর্থ আপনার সম্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে অন্য সব লোকজন। একটা সম্পত্তি ওয়াকফ বলে ঘোষণার অধিকার ওয়াকফ বোর্ডের ছিল তা খর্ব করা হল।

যে সব ওয়াকফ সম্পত্তির নথি নেই তা ওয়াকফ সম্পত্তি বলে গ্রাহ্য করা হবে না। এইসব সম্পত্তিগুলো ডি-নোটিফাই হলে প্রমোটারেদর ভাগ্য খুলে যাবে। বিজেপি ও রাজ্যে যে সরকার থাকবে তারা নির্বাচনী বন্ডের মত এদের কাছ থেকে প্রচুর কাটমানি সংগ্রহ করতে পারবে।

মহিলা ও পেশাদারদের যুক্ত করা ও মহিলাদের উত্তরাধিকার সুরক্ষিতকরা। যেদল মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে জানে না তারা মহিলাদের জন্য ভাববে এটা বিশ্বাস করতে হবে?

সীমাবদ্ধতা আইনপ্রয়োগ। যারা ১২ বছরেরবেশী সময় ধরে অবৈধভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করে আছে তার মালিকানা দাবী করতে পারবে।

ওয়াকফ নিয়েমামলা হলেওয়াকফ ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসাবে মানা নাও হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ওয়াকফ ট্রাইবুন্যালের আদেশ পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে অ্যাপিল করতে পারবে।

ওয়াকফে দানের ক্ষেত্রে কেউ কতদিন ধর্মপালন করছে তার ওপর ভিত্তি করে ওয়াকফ সীমিত করা হয়েছে । পাঁচ বছরের কম হলে তা গ্রাহ্য হবে না। ফলে সংবিধানের ২৫ তম অনুচ্ছেদে রক্ষিত ধর্মপালনের অধিকার লঙ্ঘন করা হল। একইসঙ্গে সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থলের ভিত্তিতে বৈষম্য করতে যে নিষেধ করা আছে তা লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ব্যবহারের ফলে যেসব সম্পত্তি ওয়াকফ এর মর্যাদা পেত তা স্বীকৃত না হওয়ার ফলে সংবিধানের ২৬ তম অনুচ্ছেদটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ব্যবহারকারী দ্বারা ওয়াকফ মতবাদটি বাতিল হলে তার কি প্রভাব পরবে মুসলীম সমাজের ওপর তা নিশ্চই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি যে ১৩ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট জমা দেয় তাতে সতর্ক করা হয়েছিল এই বলে যে এর ফলে বহু সম্পত্তির আইনি অবস্থান অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বিরোধীদের বিভিন্ন প্রস্তাব ও সংশোধনীগুলি সভার কার্যবিবরণী থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

এই সম্পর্কে বাবরি মসজিদ রায়ের ১১৩৪ নং প্যারাগ্রাফটির উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা রয়েছে ' waqf by users is an accepted mode of creating a waqf– waqf by users is matter of evidence and infact waqf by users is established.'

সরকার ইতিমধ্যেই প্রধান সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বাজেট ছেঁটে ফেলেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ন্যাশানাল ফেলোশিপের মত প্রকল্প তুলে দিয়েছে। সংখ্যালঘু কল্যাণের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে দূর্বল করে দেওয়া হয়েছে। এসব কাজ প্রমাণ করে এই সরকার নীতিনির্ধারণে মুসলীমদের অংশগ্রহণ করতে দিতে চায় না।

একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সামাজিক শত্রুতা,তাদের জীবনধারণ কঠিন করে তুলতে আইনি ব্যবস্থা , বুলডোজার রাজনীতি মুসলীমদের অস্তিত্বকে বিপদজনক বলে মানুষকে ভাবতে বাধ্য করছে। কাশ্মীর ফাইলস,কেরালা স্টোরি বা অধুনা ছাওয়া নামক চলচিত্রের সম্পর্কে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচারকৌশল। আসলে এসবই একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অঙ্গ। ওয়াকফে দুর্নীতি অবশ্যই আছে। তার জন্য সরকার তো তা রোধ করার সঠিক পরিকল্পনা করতে পারত। চুপচাপ ঐতিহাসিক দরগাগুলোকে বিতর্কিত সম্পত্তির তকমা দিয়ে আত্মসাৎ করতে চাইছে কেন তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। উত্তরপ্রদেশে ওয়াকফ জমি ও সম্পত্তি দখল করা হচ্ছে অতিদ্রুত। অসমও একই দিকে এগোচ্ছে মাদ্রাসাগুলির সমীক্ষার মাধ্যমে। এগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষে। গুজরাট,রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশের মত বিজেপি শাসিত রাজ্যে কবরস্থানে বুলডোজার চলেছে। ইতিহাসকে পাল্টে ফেলা অন্যতম পরিকল্পনা। দাবী করা হচ্ছে কয়েকশো বছর আগে মুসলমান শাসকেরা লুটপাট আর শোষণ চালিয়েছিল। আর বর্তমান মুসলমানেরা বহিরাগত। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর দেশের বিভিন্ন মসজিদ,উপাসনাস্থল বা ঐতিহাসিক স্থলগুলিতে হিন্দু দেবতার মূর্তির অস্তিত্ব খুঁজে বার করার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা। একই জিনিস আমরা লক্ষ করেছি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখল করে আরএসএসের শাখা চালিয়ে যেতে। জালিয়ানওয়ালাবাগসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন সৌধ ও চিহ্ন চিরতরে বিলীন করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। স্বাধীনতা সংগ্রামের বা বিজয়ের স্মারক মুছে ফেলার পরিকল্পিত চক্রান্ত। কারণ একটাই স্বাধীনতার সংগ্রামে আরএসএস ও বিজেপির পূর্বপুরুষদের ব্রিটিশ দালালি ও বেইমানির ইতিহাস দেশের মানুষকে জানতে না দেওয়া। হিটলারের ইতিহাস কি মুছে ফেলা গেছে?

রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেছেন এই আইনকে চ্যালেন্জ করে সুপ্রীম কোর্ট যাওয়ার। তিনি সতর্ক করেছেন এই বলে যেএ গুররপর আরএসএস ক্যাথলিক চার্চের জমির ওপর নজর দেবে। তিনি এই বিলটির ওপর সংসদে বলতে গিয়ে বলেছিলেন রাস্ট্রিয় মদতে মুসলমান পরিচয়কে মুছে ফেলার পরিকল্পনার একটি অঙ্গ এই বিল। তিনি এও বলেন ইতিহাসের সাক্ষীকে বিতর্কিত বলে ভেঙে ফেলা হচ্ছে,এই প্রবনতাকে যেকোন মূল্যে রুখতে হবে।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মতে এই আইন অসাংবিধানিক যা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করছে ও ব্যক্তিগত আইনকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর

Scanned with OKEN Scanner

নাগরিক বলে মনে করে তাদের সম্পত্তিকে টার্গেট করছে।দেশের আইনবিরোধী এই বিভেদমূলক অ্যাজেন্ডার বিরোধীতা তাই সর্বস্তরে করা দরকার বলে তিনি মনে করেছেন।

সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বলেন বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য এই বিল আনা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন নোটবন্দীর ফলে সমস্যা, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, গঙ্গা যমুনা পরিছন্ন করার কি হল? দত্তক নেওয়া গ্রামগুলির কি অবস্থা? তিনি মনে করেন মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ও তাদের প্রান্তিক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিল।

কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভির মতে শবরীমালা মামলায় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ ছিল কোনও প্রথা বা ধর্মচারণ যদি সেই ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়, তা সংবিধানের ২৫ ও ২৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুরক্ষিত।যদি আইন কোনও ধর্মের প্রতিষ্ঠান চালাতে বাধা দেয়, সেই আইন অসাংবিধানিক। এই নির্দেশ সকল ধর্মের জন্য প্রযোজ্য। তাই এই আইনকে চ্যালেন্জ করা যাবে।

শিবসেনার নেতা সন্জয় রাউত বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন,আপনারা কবে থেকে মুসলমানের জন্য চিন্তিত হলেন? আসলে চিন্তা এদের সম্পত্তি নিয়ে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসসহ বিভিন্ন বিরোধীদল আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানত সংবিধানের ১৪তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সমতার অধিকার, ২৫তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ধর্মাচরনের স্বাধীনতা, ২৬তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা, ২৯তম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং ৩০০ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন করেছে এই আইন। এর ওপরেই হবে মামলা।

নেপালে রাজনৈতিক অচলাবস্থা : ফিরে দেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি নেপাল। একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুমোদন করার পরও ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, দলাদলি এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাবে সংকটের মুখোমুখি দেশ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং চটজলদি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপতৎপরতা এখনকার অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির সব প্রতিশ্রুতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। ক্ষমতাসীন জোটের ভেতরকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো প্রমাণ করেছে, নেপালের রাজনৈতিক কাঠামো দুর্বল। ফেডারেল বা প্রাদেশিক সরকারগুলিতে দল এবং নেতাদের ঘন ঘন পুনর্বিন্যাসের কারণে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি নীতি বস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কিন্তু নেতাদের জীবনযাত্রার মান রাজপরিবারের চেয়েও ওপরে উঠে গেছে। এখন সাধারণ মানুষ বলতে শুরু করেছে, 'দশ হাজার মহারাজাকে খাওয়ানোর চেয়ে একজন মহারাজাকে (রাজাকে) খাওয়ানো ভালো।' সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, নেপালে জবাবদিহিতার কোনো বালাই নেই। কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, যুবকদের বেকারত্ব দূরীকরণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে এবং ভারত ও চীনের সঙ্গে নেপালের পররাষ্ট্রনীতির বিষয়টা স্পষ্ট না করে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। নেপালি কংগ্রেস, সিপিএন-ইউএমএল এবং সিপিএন (মাওবাদী কেন্দ্র)-এর মতো প্রধান দলগুলি তরুণ প্রজন্মকে হতাশ করেছে। তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সংসদ বারবার অচল হচ্ছে, আইন প্রণয়নের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এত ছোট একটি দেশের জন্য ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশাল আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসদে ফেডারেল সরকার এবং পাঁচটি প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন ৮৫০ জন। একইভাবে, প্রায় ৪০ হাজার স্থানীয় প্রতিনিধি আছেন। তাঁদের বেতন- ভাতা দিতে বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হয়। নেপালের নাগরিকদের ইতিমধ্যে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০ হাজার নেপালি রুপি।

নেপাল বর্তমানে প্রায় একশো ভাগ আমদানি নির্ভর। কিছুই রপ্তানি করতে পারে না। একসময় নেপাল ভারতে চাল ও সরষে রপ্তানি করত। কিন্তু সেটি এখন অতীত। নেপালে সাধারণ মানুষের জন্য কোনো কর্মসংস্থান নেই। চাকরির যেটুকু সংস্থান আছে, তা কেবল রাজনৈতিক দলের ক্যাডাররাই পেয়ে থাকে। এই কারণে নেপালের গ্রামে গ্রামে এখন তরুণদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের প্রায় সবাই সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে কাজ করতে চলে গেছে। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআইএ)-এর ইমিগ্রেশন অফিসের মতে, 'গত পাঁচ বছরে নেপাল থেকে প্রায় ৩১ লাখ মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছে। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সে দেশটির অর্থনীতি কোনোমতে টিকে অছে। আমাদের অর্থনীতির ৫০ শতাংশ রেমিট্যান্সনির্ভর।'

অধিক অন্তর্ভুক্তি ও বিকেন্দ্রীকরণের সুফলের ধুয়া তুলে প্রবর্তিত ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেপালের জন্য বিশাল প্রশাসনিক বোঝায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতার অভাব, ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে দুর্বল সমন্বয় এবং দ্বৈত শাসনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেপালে ব্যয়বহুল ও অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এদিকে আদালত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও পরিচয় হারিয়ে রাজনৈতিক শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সেই কারণে গণতন্ত্র সুসংহত এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় থাকছে না।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে নেপাল দুটি বৃহৎ শক্তির মাঝখানে অবস্থিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে দেশটি এই অবস্থানের সুবিধা নিতে অক্ষম। বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে কেবল রাজনৈতিক দলগুলোকেই নয়, বরং উন্নত ভবিষ্যতের আশা করা প্রতিটি নেপালিকে এর মূল্য দিতে হবে।

Scanned with OKEN Scanner

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নেপালের রাজনৈতিক বিতর্কে সাবেক রাজা জানেন্দ্রের নাম আগের চেয়ে বেশি করে প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে। যদিও অনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৮ সালে দেশটি একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, তবুও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো এবং বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলা নাগরিকদের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে পুরোনো রাজতন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

২০০৫ সালের রাজকীয় ক্যু এবং প্রত্যক্ষ শাসনের জন্য একসময় ব্যাপকভাবে সমালোচিত রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে এখন জনগণের একটি অংশ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। কেউ কেউ তাকে জাতীয় পরিচয়, স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করছে। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এসব উপাদান দিন দিন গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপক দুর্নীতি, প্রশাসনে ঘন ঘন পরিবর্তন এবং দলগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে জনগণের মধ্যে যে আস্থার শূন্যতা দেখা দিয়েছে, সেই শূন্যস্থানে রাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার প্রতি তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে।

খুব বড় আকারে না হলেও রাজতন্ত্রের পক্ষে দেশব্যাপী ঘনঘন বিক্ষোভ হচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধরা রাজতন্ত্র পুনর্বহালের জন্য গণভোটের দাবি তুলছে, হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য স্লোগান দিচ্ছে, পুরোনো জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছে। নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। যদিও এসব বিক্ষোভকারী এখনো নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

তবে, এই গণআন্দোলন শেষ পর্যন্ত কোন রাস্তা নেবে, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। বর্তমানে যে রাজতন্ত্রকে অনেকে মুক্তির পথ হিসেবে দেখছে, একসময় তা জাতীয় অস্থিরতার কারণ ছিল। রাজা জানেন্দ্রর কর্তৃত্ববাদী শাসনের কথাও সবার মনে আছে। তারপরও বর্তমান অস্থিরতা নতুন সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং বছরের পর বছর ধরে কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক অগ্রগতির কবর রচনা করতে পারে।

২

২০০১ সালে নেপালের তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহকে সপরিবার হত্যা করা হয়। বড় ভাই বীরেন্দ্র নিহত হওয়ার পর ওই বছরই রাজা হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রর অভিষেক হয়। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৭ বছর। জ্ঞানেন্দ্র ২০০৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তখন তাঁর নির্বাহী ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। তবে ২০০৫ সালে জ্ঞানেন্দ্র পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ঘোষণা করেন, রাজতন্ত্রবিরোধী মাওবাদী বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার জন্য তিনি কাজ করছেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্র তখন সরকার ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেন, রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও সাংবাদিকদের কারাগারে পাঠান। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং শাসন কায়েম রাখতে তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন।

এর ফলে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। একপর্যায়ে ২০০৬ সালে জ্ঞানেন্দ্র একটি বহুদলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মাওবাদীদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে সরকার। এর মধ্য দিয়ে এক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। ২০০৮ সালে নেপালের ২৪০ বছরের পুরোনো হিন্দু রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার জন্য নেপালের পার্লামেন্টে ভোট হয়। ভোটাভুটিতে রাজতন্ত্র বিলোপের পক্ষে রায় হলে রাজা জ্ঞানেন্দ্র পদত্যাগ করেন। এরপর নেপালে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে নেপালে ১৩টি সরকার বদলেছে। এই ভাবে ঘনঘন সরকার বদলের ফলে সে দেশের অনেকে প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার প্রতি হতাশ হয়ে পড়েছে। তাঁদের দাবি, প্রজাতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনীতির বেহাল অবস্থা এবং ব্যাপক দুর্নীতির জন্যও প্রজাতন্ত্রকে দায়ী করেছেন তাঁরা।

আজকের যে নেপাল আমরা দেখি, ১৭৬৮ সালে রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ গোটা অঞ্চলটাকে একত্রিত করে এই দেশটি তৈরি করেছিলেন। তৎকালীন সেনা প্রধান জঙ্গ বাহাদুর রানা ১৮৪৬ সালে রক্তাক্ত গণহত্যার মধ্যে দিয়ে রানা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলস্বরূপ, ১৮৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নেপাল রাজার পরিবর্তে একজন রানা প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেন। দ্বিতীয় ধারা অনুসারে, নেপালে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনা হয় ১৯৫১ সালে। নেপালের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ গোষ্ঠী, প্রায় ১০০টি ভাষা এবং অসংখ্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি নিয়ে নেপাল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক উদাহরণ। নেপাল বহুজাতিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেয়ে থাকে। ওই একটি গোষ্ঠী ওই বিজয়ের পর থেকে দেশটি শাসন করে আসছে। ওই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ছেত্রী, ভাউন, সন্ন্যাসী এবং ঠাকুরি। নেপাল বিশ্বের দরিদ্রতম অর্থনীতির একটি দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় মাত্র ৪৪৭ ডলার। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ১৬৯টি দেশের মধ্যে নেপাল ১৩৮ তম স্থানে।

গাজায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করেছে ইসরাইল

সৌর বসু

সম্প্রতি 'নো আদারল্যান্ড' তথ্যচিত্রটি অস্কার পুরস্কার লাভ করেছে। তথ্যচিত্রটির নির্মাতা ইসরাইলের যুবাল আব্রাহাম এবং ফিলিস্তিনের রাসেল আদ্রা। অস্কার পুরস্কার ছাড়াও ছবিটি বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবসহ আরো অন্যান্য পুরস্কারও লাভ করে। ছবিটি মুক্তি পায় ২০২৩ সালে ৭ই অক্টোবর হামাস কর্তৃক ইসরাইল আক্রমণের কিছু পরে। তথ্যচিত্রটির বিষয়বস্তু মূলত ইসরাইল কর্তৃক গাজার অসামরিক জনগণের উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ এবং তার পরিণতি। তথ্যচিত্রের পরিচালক ২৮ বছর বয়স্ক রাসেল আদ্রা , ওয়েস্ট ব্যাংকের

Scanned with OKEN Scanner

দক্ষিণে তাঁর জন্মস্থান (একটি ছোট দুর্গম অঞ্চল) , মাসাফের ইয়াত্তার ধ্বংস লীলার ছবি চিত্রায়িত করেছেন। ইসরাইলি সেনারা গ্রামের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে অঞ্চলটিকে একটি সামরিক প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। তথ্যচিত্রটিতে দেখা গেছে স্কুল বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং একটি কূয়োর মধ্যে সিমেন্ট ফেলে কূয়োটি ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর ইসরাইল যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে ,তার ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। ইসরাইল সেনাবাহিনীর নৃশংসতার, সাক্ষ্য বহন করছে এই তথ্যচিত্রটি। তথ্যচিত্রটির নির্মাতাদের একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক এবং অপরজন বাস করে সামরিক শাসনের অধীনে, প্রতিমুহূর্তে যে ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছে।ইসরাইলের নাগরিক তথ্যচিত্রের নির্মাতা যুবাল আব্রাহাম অস্কার গ্রহণের সময় বলেছেন, আমি যখন আদ্রার দিকে তাকাই তখন আমার ভাইকে দেখতে পাই। যদিও আমরা বাস করি দুটি বিপরীত ধর্মী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। আমি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক এবং আদ্রা সামরিক শাসনের অধীনে ধ্বংসস্তূপ এর মধ্যে বাস করে। তবু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে নো আদারল্যান্ড ছবিটি নির্মাণ করেছি, আমাদের বক্তব্য আরো জোরালো করে তোলার জন্য। গাজা ভূখণ্ডে যে পরিকল্পিত ধ্বংসলীলা চলছে, সেখানকার মানুষেরা কতখানি অসহায় , এই তথ্যচিত্রটি তার একটি দলিল স্বরূপ। প্যালেস্টাইনের তথ্যচিত্র নির্মাতা আদ্রা বলেছেন আমি চাই এই ধ্বংসলীলা বন্ধ হোক। দীর্ঘদিন ধরে আমরা অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করে আসছি। ফিলিস্তিনি জনগণকে নির্মূল করার যে প্রকল্প তার প্রতিরোধ কল্পে আমি বিশ্বের মানুষকে পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানাই।

অস্কারপ্রাপ্ত এই তথ্যচিত্রটি আরো অন্যান্য পুরস্কারে ভূষিত হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনের জন্য কোন পরিবেশক পাওয়া যায়নি। 'নো আদারল্যান্ড' তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে ২০১৯ থেকে ২০২৩ এই সময়কালের ঘটনার উপর নির্ভর করে। হামাস ইসরাইল আক্রমণ করে২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর। তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয় হামাসের আক্রমণের আগে। হামাসের আক্রমণের জন্যই পাল্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছে ইজরাইল এটা মোটেই বাস্তবসম্মত বিবৃতি নয়। ইসরাইল গাজা ভূখণ্ড থেকে ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে, পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের দিকে তাকালে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯১৭ সালের বেলফোর ডিক্লারেশনের মধ্যেই ইসরাইলের জন্মবীজ নিহিত ছিল। গ্রেট ব্রিটেন সর্বসম্মুখে ঘোষণা করে যে ,ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করতে তারা দায়বদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিল, প্যালেস্টাইন অঞ্চলটি দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। একটি রাষ্ট্র আরবদের থাকবে এবং অপরটি ইহুদিদের হবে। জেরুজালেম থাকবে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৮ সালের প্যালেস্টাইন থেকে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পর ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও , আরবদের জন্য কোন স্বীকৃতি মেলেনি ।ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরেই প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী আরবরা উদ্বাস্তু হয়ে মিশর জর্ডান সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। এরপর থেকেই প্যালেস্টাইনে অবস্থিত গাজা ভূখণ্ড অধিকার করার জন্য ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের উপর নৃশংস হামলা চালাতে থাকে। কাজেই হামাস কর্তৃক ইসরায়েল আক্রমণের জন্যই ফিলিস্তিনিদের ফল ভোগ করতে হচ্ছে এ তথ্য সর্বৈব মিথ্যা।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফার ক্ষমতায় এসে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেছেন কয়েক সপ্তাহ হয়েছে। তার মধ্যেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়াও তার আগ্রাসী মনোভাব বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। পশ্চিম এশিয়ায় তিনি যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তার লক্ষ্য ছিল তার পূর্বসূরী বাইডেন প্রশাসনকে হেনস্থা করা। শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে যদি পূর্বসূরীকে অপদস্থ করা লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইজরায়েল এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার কোনো মানবিক মুখ ছিল না ,ছিল শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা । ফলে প্রায় দুমাস আপাত শান্তি বজায় থাকার পর ইসরাইল, গাজা এবং সংলগ্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ শুরু করে। গাজায় ৪০ জন নিহত হয় এবং সমসংখ্যক মানুষ আহত হয়। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশ শিশু এবং মহিলা। এছাড়া সাধারণ নাগরিকদের বাড়িঘর , তাঁবু বোমার গায়ে ভেঙে পড়ে, গাজার পুরনো ছবি আবার ফিরে আসে। গাজাবাসীদের দেখা যায় তাদের আহত আত্মীয়দের দেহ নিয়ে হাসপাতালমুখী হোতে।

গত জানুয়ারি মাসে ইসরাইলের সঙ্গে প্যালেস্টাইন জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনটি ধাপে যুদ্ধ বিরতির কাজ সম্পন্ন হবে বলে স্থির হয়। হামাস চুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৩ জন ইসরাইলি বন্দিকে মুক্তি দেয় এবং ইসরাইল ও বন্দীদের মুক্তি দেয়। কিন্তু ইসরাইল প্রথম ধাপের পর থেকে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কাজ শুরু করে দেয়। গাজাতে যেকোনো মানবিক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে তারা বাধা দেয় । গাজাব সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগরিকদের উপর হত্যা লীলা অব্যাহত থাকে।। গাজা এলাকার বাসিন্দাদের জন্য বাসস্থান পুনর্নির্মাণের যাবতীয় সামগ্রী প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বাস্তুচ্যুত গাজাবাসীর জন্য প্রিফেব্রিকেটেড বাসস্থান বা তাঁবু প্রভৃতি সরঞ্জাম প্রবেশের ক্ষেত্রে অবরোধ সৃষ্টি করে।

প্রকৃতপক্ষে ইসরাইল বা আমেরিকা প্যালেস্টাইন ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনিওদের নির্মূল করে সমগ্র অঞ্চলটি দখল করতে চায়। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা

Scanned with OKEN Scanner

করেছে যে গাজা সংলগ্ন অঞ্চলে তিনি একটি প্রমোদ নগরী গড়ে তুলবেন। যেখানে বিলাসবহুল হোটেল গড়ে উঠবে নতুন বাসস্থান তৈরি হবে , আধুনিক মল বা বাজার তৈরি হবে। গাজার আরব অধিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত না করলে ট্রাম্পের মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। সেজন্যই গাজা ভূখণ্ড যতক্ষণ না অবধি ফিলিস্তিনি মুক্ত হচ্ছে, যুদ্ধের অবসান হবে না, শান্তিও ফিরে আসবে না । সম্প্রতি হোয়াইট হাউজের এক মুখপাত্র ফক্স নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে ইসরাইল, ট্রাম্প প্রশাসন এবং হোয়াইট হাউজের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে গাজা ভূখণ্ডে আক্রমণ চালাচ্ছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য হামাস ইসরাইলি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে অপারগ। সমস্ত বন্দিদের ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ইসরাইল গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাবে। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই।

হামাস নেতা আল-কানৌ মনে করেন নেতানিয়াহু ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে গাজায় আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে নেতানিয়াহু র চরম সমালোচনা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দুর্নীতির জোরালো অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণে নেতানিয়াহুর আসন টলোমলো। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে নেতানিয়াহুর ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এছাড়াও নেতানিয়াহুর দক্ষিণপন্থী সরকার যুদ্ধ বিরতির বিপক্ষে।

ইসরাইল চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তন চায়। যুদ্ধ বিরতির দ্বিতীয় পর্যায় যা ১ মার্চ শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং ইসরাইল কর্তৃক সেনাবাহিনী, সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাহার করার আহ্বান ছিল, নেতানিয়াহু সেটা মানেননি। গাজার ২০ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকাংশ গৃহহীন হওয়ার পর এবং প্রায় ৪৮ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হবার পরও তিনি যুদ্ধ থামানোর পক্ষপাতী নন।

পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলো এখন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। ফিলিস্তিনি জনগণ সম্পর্কে তারা কোনও অবস্থান গ্রহণ করতে পারছেন না। যদিও তারা ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকিকরণে চুক্তি করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ৭ অক্টোবর হামাস কর্তৃক ইসরাইল আক্রমণের পর, ইসরাইল যে অবস্থান গ্রহণ করে, অর্থাৎ ফিলিস্তিনিদের উপর নির্বিচার বোমাবর্ষণ, আরব দেশগুলো সেটা মেনে নিতে পারেনি।

অন্যদিকে ইসরায়েলের সৌদি আরবকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ , আরব রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ট্রাম্পের গাজা সম্পর্কিত বিলাসবহুল শহর পত্তনের ঘোষণার, সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ বিরোধিতা করে।

সম্প্রতি সৌদি আরবে ডাকা একটি সম্মেলনে আরব দেশগুলো ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনির সমস্যা নিয়ে ঐকমত্যে আসতে পারেনি। কারণ আরব দেশগুলির ঐকমত্যে আসার ক্ষেত্রে মিশর এবং জর্ডান বড় বাধা। তাদের অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা। এই দেশ দুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে জর্ডান এবং মিশর এই দেশ দুটিতে সর্বাপেক্ষা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। গাজা থেকে আরবদের নির্মূল করা হলে, তার চাপ এসে পড়বে, এই দুটি দেশের ওপর। মিশর ও জর্ডানের দুর্বল অর্থনীতি এই অভিঘাত সইতে পারবে কিনা বলা সম্ভব নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা সম্পর্কিত নীতি (গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তবচ্যুত করে অন্য আরব দেশগুলিতে পুনর্বাসন দেওয়া) আরব দেশগুলির সমর্থন করার অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করা। সার্বভৌম আরব রাষ্ট্রগুলি সে ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিড়নকে পরিণত হবে।

উদার গণতন্ত্রের বেলুন চুপসে দিলেন দুই মাইক্রোসফট কন্যা ইবতিহাল ও ভানিয়া

মনিরুল হক

"... MICROSOFT CLOUD AND AI ARE THE BOMBS AND BULLETS OF THE 21ST CENTURY"
---VANIYA AGARWAL (Microsoft Employee)

গণতন্ত্রের কথা উঠলেই ইউরোপ আর আমেরিকার কর্তাব্যক্তিরা আপন আপন তর্জনি বুকে ঠেকিয়ে বলেন, - এই যে, আমরা। আমরাই গণতন্ত্রের সেবক; গণতন্ত্র মানে উদার গণতন্ত্র। উদার গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে জগৎ বিখ্যাত কোম্পানি মাইক্রোসফটের সম্মেলন কক্ষে দুই উজ্জ্বল তরুনী ইবতিহাল আবৌসাদ ও ভানিয়া আগরওয়াল গাজায় নিরীহ মানুষ খুন করতে ইজরায়েলকে উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করায় নিজের কোম্পানি মাইক্রোসফটকেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং তারপর কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের পর ভানিয়া বলেছেন; পদত্যাগ করে তিনি গর্বিত নন বরং পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

দেড় বছর আগে ইজরায়েলের উপর হামাসের অতর্কিত আক্রমণের পর থেকে যা চলছে তা রাজনীতির পরিভাষায় যুদ্ধ হলেও তাতে হামাসের ভূমিকা খুবই কম। একতরফা ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইজরায়েল। এ কাজে তারা সাহায্য নিচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির। আর এই প্রযুক্তির প্রধান সরবরাহকারী হল টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট। তারা ইজরায়েলে AI প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলেছে এবং এই প্রযুক্তির সাহায্যে আরও নিখুঁতভাবে গাজা ও লেবাননে মানুষ খুন করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু তাদের AI বিভাগে প্রযুক্তিবিদ হিসাবে কাজ করছেন ইবতিহাল আবৌসাদ ও ভানিয়া আগরওয়ালের মত আরও অনেক প্রযুক্তিবিদরা যাঁরা পরিস্কার বুঝতে পারছেন তাঁদের গবেষণা ও কাজের ফলে যা অর্জিত হচ্ছে তা ব্যবহার করা হচ্ছে গাজা ও লেবাননের নিরীহ মানুষকে বিনা অপরাধে নির্বিচারে খুন করার জন্য।

এই প্রযুক্তিবিদরা প্রথম থেকেই তাঁদের উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আসছিলেন যাতে জ্জ্জ প্রযুক্তি মানুষ খুনে প্রযোগ না

Scanned with OKEN Scanner

করা হয় কিন্তু কতৃপক্ষ সে আবেদনে সাড়া দেননি। এই বছরের গোড়ার দিকে সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে কোম্পানির বর্তমান প্রধান সত্য নাদেলার সঙ্গে এক বৈঠকও হয়। কিন্তু তাতেও কোম্পানিকে টলানো যায় নি, উল্টে পাঁচজন প্রতিবাদী বরখাস্ত হন। এরপর প্রযুক্তিবিদরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই কোম্পানির ৫০ তম বর্ষ উদযাপনের মঞ্চকেই বেছে নেই প্রতিবাদের জায়গা হিসাবে।

মাইক্রোসফটের AI প্রধান সিরিয়ার মুস্তাফা যখন উৎসব মঞ্চে কোম্পানির গুণকীর্তন করছিলেন তখন মরক্কোর মেয়ে ইবতিহাল আবৌসাদ বলে ওঠেন,-" Mustafa– you should be ashemed. You are war profitiers. Stop using AI for genocide– Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood in your hand. How dare you all celebrate when microsoft is killing Children Shame on youæ Shame on youæ পরে ইবতিহাল বলেন- 'Mustafa– your family back in Syria will know who you really are'.

সুযোগ খুঁজছিলেন ভানিয়াও। পরের একটি সেশনে যখন মঞ্চ আলো করে বসে আছেন সত্য নাদেলা, বিল গেটস এবং স্টিভ বলমার তখন উঠে দাঁড়ান তিনি। স্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠেন, " Shame on you all. You are all hypocrites. Fifty Thousand Palestinian in Gaza have been murdered with mycrosoft technology. Shame on all of you for celebrating in their Blood. Cut ties with Israel".

পরে এক সাক্ষাৎকারে ভানিয়া আগরওয়াল বলেছেন, আমরা অনেকদিন আগে থেকেই বর্ণবাদী ইজরায়েলকে প্রযুক্তি সরবরাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি। ১০০০ এর বেশি প্রযুক্তিবিদদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছি। এর পরেই বলেন সেই মোক্ষম কথাটি। তিনি বলেন, আমরা সবাইকে এই কথাটি জানাতে চাই যে, এই একবিংশ শতাধীতে মাইক্রোসফটের CLOUD এবং AI -ই হল Bomb এবং Bullet।

ইবতিহাল আবৌসাদ এবং ভানিয়া আগরওয়াল, এই দুই কন্যাই মাইক্রোসফট ত্যাগ করেছেন কিন্তু আরও বেশি বেশি জড়িয়ে পড়েছেন আন্দোলনের সাথে। মাইক্রোসফটে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে পেশ করা হয়েছে চার দফা দাবিপত্র। সেগুলি হল-

১. ইজরায়েল সেনাবাহিনী ও সরকারের সঙ্গে মাইক্রোসফটের সমস্ত চুক্তি বাতিল করতে হবে।

২. ইজরায়েল সরকারের সঙ্গে যে সব চুক্তি আছে তা প্রকাশ করতে হবে। অস্ত্র উৎপাদনকারী এবং কন্ট্রাক্টরদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্যও প্রকাশ্যে আনতে হবে। প্রযুক্তি, পরিষেবা , বিনিয়োগ এবং চুক্তিসমূহকে নিরপেক্ষ তদন্তের আওতায় আনতে হবে।

৩. গণহত্যা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. কর্মচারী ও প্রযুক্তিবিদদের মতামতকে মর্যাদা দিতে হবে। ফিলিস্তিনি, আরব, মুসলিম ও তাদের সহযোগী কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, কোম্পানির অভ্যন্তরে ফান্ড-রেজিং এর ব্যবস্থা অব্যহত রাখতে হবে।

মাইক্রোসফট কোম্পানির প্রযুক্তিবিদদের এই প্রতিবাদ-আন্দোলন সারা পৃথিবীর মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রযুক্তিবিদরা উপলব্ধি করেছেন, বিপুল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ থাকলেও তাঁরা আসলে পুঁজির দাস। ইবতিহাল আবৌসাদ প্রতি মাসে অর্জন করতেন ভারতীয় মুদ্রায় ১৭ লক্ষ টাকা। তিনিও প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটলেন অথবা বলা ভালো হাঁটতে বাধ্য হলেন। আমরা বুঝলাম, শুধুমাত্র নৈতিক অবস্থান থেকেই এই প্রযুক্তিবিদরা নিজেদের সঙ্কটকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তাঁদের গবেষনালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে যাঁদের খতম করা হবে তাঁরা তাঁদের মতোই কোনও মানুষ। এক্ষেত্রে হত্যার ক্রুশ তাঁরা নিজেরা বহন করতে অস্বীকার করছেন।

'গণ' ছাড়া তো গণতন্ত্র হয় না। গণতন্ত্র নিয়ে বড়াই করা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজা অঞ্চল থেকে সেই 'গণ' কেই মুছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর তাদের আধুনিকতম সংস্থা মাইক্রোসফটে যে তিল পরিমাণ গণতন্ত্র নেই তা তারা নিজেরাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। শুধু মাইক্রোসফট কেন, গাজা ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও ছাত্রও যদি ইজারেয়েল বিরুদ্ধতা করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। এই হচ্ছে মুক্ত বা অবাধ গণতান্ত্রিক দেশের অবস্থা। গাজার জনগণ আবার স্বমর্যাদায় গাজায় ফিরবে কি না বা ফিরলে কবে ফিরবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু গাজা সঙ্কট প্রমাণ করে দিল সাধারণ মানুষের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্র ইউরোপ-আমেরিকায় নেই; যা আছে তা হল লগ্নি পুঁজিকে বাঁচানোর কোন এক আজব তন্ত্র যার সঙ্গে

গণমানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। গাজার ঘটনায় গণতন্ত্রের নকশাকাটা জোব্বা আরও একবার খসে পড়ল ইউরোপ-আমেরিকার শরীর থেকে, আমরা এখন দেখছি তার কঙ্কালসার চেহারা !

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা

সৌর বসু

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির ফলে সমস্ত বিশ্বজুড়ে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ইউরোপের ম্যাক্রো ওলাফ , স্কোলজ প্রমুখ নেতারা এই শুল্কনীতিকে ভিত্তিহীন, নৃশংস প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। ফরাসি পত্রিকা লে মন্ডের বক্তব্য এই শুল্ক নীতি প্রতিহিংসামূলক এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই শুল্ক নীতি বিশ্বব্যাপী এক বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনাকারী। এর ফলে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারের পতন ঘটেছে, আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং কয়েকদিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ডলার বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিজের দেশ আমেরিকাতেও এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

আমেরিকার জনপ্রিয় টাইম পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় আমেরিকানদের এই শুল্কনীতি বেশি ক্ষতি করতে পারে।'এর ফলে সমস্ত আমদানিতে মার্কিন ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং মার্কিন ভোক্তাদের বেশি দামে পণ্য ক্রয় করতে হবে ।এছাড়াও এই শুল্কনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মন্দার দিকে নিয়ে যেতে পারে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা যদি শুল্কের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় , তার ভার ভোক্তাদের উপর অর্পণ করে, তাহলে চাহিদা হ্রাস পাবে, পণ্য বিক্রি কমে আসবে এবং এর ফলে বিভিন্ন শিল্প থেকে কর্মীদের ছাটাই করা হবে।

অন্যদিকে শিল্পপতিরা যদি শুল্কবৃদ্ধির এই ভার নিজেরা বহন করতে চায়, তাহলে তাদের লাভের পরিমাণ কমে আসবে। আমেরিকার অর্থনীতিতে সাধারণত ঋণের উপর সুদের হার কম রাখা হয়। বনড আমেরিকা বাসীর বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য স্থল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকায় ঋনের উপর সুদের হার গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাক্তন মার্কিন শীর্ষ ট্রেজারি কর্মকর্তা বলেছেন ' আমি মনে করি ট্রাম্পের বাণিজ্য দৃষ্টিভঙ্গি বোকামি এবং উন্মাদনার মিশ্রণ। তিনি মার্কিন অর্থনীতির ক্ষতি করে চলেছেন এবং একটি অপ্রয়োজনীয় সংকট তৈরি করেছেনা '। তিনি আরো বলেছেন 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্তমান পদক্ষেপ গুলি ডলারের আধিপত্যের ক্ষয়কে নিশ্চিত ভাবে ত্বরান্বিত করবে এবং বৈশ্বিক বাজারে আরও অস্থিরতা নিয়ে আসবে।'

আমেরিকার এই অস্থির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ সমাবেশ। প্রায় ছয় লক্ষ মানুষ এই সমাবেশে যোগদান করে।' হ্যান্ডস অফ' নামক এই প্রতিবাদী কর্মসূচি টি অনুসারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী, সামাজিক নিরাপত্তার সদর দপ্তর, ফেডারেল ভবন সহ বিভিন্ন জায়গায়। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক অধিকার সংগঠন ,বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন এই বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব প্রদান করে। তাদের মূল দাবিগুলোর মধ্যে ছিল ট্রাম্প প্রশাসনের দুর্নীতির অবসান, চাকরি থেকে ছাটাই রোধ করা, সামাজিক নিরাপত্তা, জনমুখী কর্মসূচি গুলির তহবিল সঙ্কোচন বন্ধ করা , অভিবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় মানুষের উপর আক্রমণের অবসান ঘটানো।

লস এঞ্জেলেসে বিক্ষোভকারীরা সিটি হলের দিকে যাওয়ার সময় স্লোগান তোলে। ' জনগণের কাছে ক্ষমতা, প্রতিরোধ করো প্রতিরোধ করো' সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে তারা পথ অতিক্রম করে।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা। ফ্লোরিডার প্রতিনিধি ম্যাক্সওয়েল ফ্রস্ট বলেন, মানব ইতিহাস জুড়ে দেখা গেছে যে কর্তৃত্ববাদীরা কখনোই তাদের ক্ষমতা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তারা আইন ভঙ্গ করে ক্ষমতা ভোগ করেন এবং তারপর জনসাধারণের দিকে ফিরে দেখেন তাদের প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে। তিনি আমেরিকার বর্তমান রাজনীতিকে কর্তৃত্ববাদের ছলনাময়ী উত্থান বলে বর্ণনা করেছেন।

ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ফেডারেল ব্যয় সংকুচিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার ফলে হাজার হাজার ফেডারেল কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বিক্ষোভ সমাবেশ আমেরিকাতে এর আগেও অনেক হয়েছে। সে সমস্ত সমাবেশে তরুণ এবং যুবরা বেশি অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু ট্রাম্প দ্বিতীয় দফার ক্ষমতায় আসার পর অ্যামেরিকা জুড়ে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে যুবকদের পাশাপাশি মাঝবয়সী এবং বয়স্ক মানুষদের অংশগ্রহণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিক্ষোভ সমাবেশের ইতি এখানেই ঘটবে ভাবলে ভুল হবে। আমেরিকার মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ উত্তোরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড : সাম্রাজ্যবাদী কলঙ্ক ও জনগণের ত্যাগের ইতিবৃত্ত

শুভ মিত্র

গত ১৩ এপ্রিল পূর্ণ হল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ১০৫ তম বর্ষ যা সভ্যতার ইতিহাসে অপরিসীম লজ্জা ।ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন নৃশংস রূপ সেদিন সারা বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বলতে হয়েছিল, জোয়ান অব আর্ককে পুড়িয়ে মারার পর বৃটেনের ইতিহাসে এমন কলঙ্কজনক ঘটনা আর ঘটেনি। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন । গান্ধিজি ও হাকিম আজমল খাঁ কাইজার ই হিন্দ খেতাব ত্যাগ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪ --১৯১৮) ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করা সত্বেও কোনও শাসনতান্ত্রিক অধিকারই ভারতবাসীকে দেওয়া হলনা ।উল্টে ২১ মার্চ ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ রাজ ভারতে চালু করল ' রাউলাট অ্যাক্ট ' নামে এক দানবীয় দমনমূলক আইন। না উকিল, না আপিল, না দলিল। এর প্রতিবাদে ৬ এপ্রিল থেকে হরতাল ডাকা হয়। সেইমত মহাত্মাজি নির্দেশও দিলেন। সত্যাগ্রহের সূচনা হল হরতালের মাধ্যমে। সারা দেশ পালন করল স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ হরতাল। ৮ তারিখে পাঞ্জাব যাওয়ার সময় মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করা হল দিল্লি স্টেশনে। অনুসুয়া বেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর রটলো। আমেদাবাদে উত্তেজিত সুতোকল মিল শ্রমিকেরা কলকারখানা ছেড়ে রাস্তায় নামলো। টেলিগ্রাফের তার কাটলো,পুলিশের দিকে ইট ছুঁড়লো ।সরকারি বাড়ী পোড়ালো। গান্ধীজি বললেন সত্যাগ্রহ মানে হিংসা,লুঠতরাজ বা অগ্নিকান্ড নয়। যা ঘটেছে তার জন্য আমায় জেল বা ফাঁসী যাই হোক না আমি তা মেনে নেব। লাহোরে বিশাল জনতা ম্যালে এসে পৌঁছলে পুলিশ গুলি চালাল। বহু হতাহত হলেন। ইতিমধ্যে ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালকে অমৃতসরে গ্রেপ্তার করে শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তুমুল বিক্ষোভ শুরু, যার পরিণতি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড।

Scanned with OKEN Scanner

১৩ এপ্রিল শিখদের গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বৈশাখি'র দিন বিকালে অমৃতসর শহরে স্বর্ণমন্দিরের কাছেই জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে ডাকা হল প্রতিবাদসভা। সব ধর্মের মানুষ ওই সমাবেশে যোগ দিতে আসেন। দুপুরে সেনানায়ক ডায়ার ৯০ জন সৈন্য ও মেশিনগান বসানো একজোড়া সাঁজোয়াগাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল ঐ ময়দানের উদ্দেশ্যে। ময়দানের চারিদিক একতলা দোতলা বাড়ী দিয়ে ঘেরা,মাঝখানে ২০/২২ বিঘার একটা এবড়ো খেবড়ো অপরিষ্কার জমি। একধারে একটা কূপ,মাঝামাঝি জায়গায় একটা সমাধির সামনে একটা দেওয়াল। কোন গেট বা রাস্তা নেই।বাগান বা ফুল তো দূরের কথা। হাত পাঁচেক চওড়া একটা প্রবেশপথ যার মধ্যে দিয়ে সাঁজোয়াগাড়ি ঢোকা সম্ভব নয়।তাই সামরিক অফিসার ও তার পিছনে দুটি সারিতে সৈন্যরা এগিয়ে চলল প্রতিবাদী জনতাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের নির্দেশে গুলি চললো। ডায়ার চেঁচিয়ে বললেন মাথার ওপরে নয়,বন্দুক নীচে নামিয়ে যেখানে বেশী ভীড় সেদিকে গুলি কর। একমাত্র রাস্তা বন্ধ, জনতা পালাবে কোনখান দিয়ে ? রক্তাক্ত হল জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দান।

বেসরকারি মতে হাজার মানুষের প্রাণ যায়। আহত অসংখ্য। যারা পাঁচিল টপকাতে গেল ডায়ারের বন্দুক তাদের রেহাই দেয় নি। সেই প্রাচীরে অনেক গুলির দাগ এখনও অক্ষত আছে। বিজেপি সরকার এই চিহ্ন মুছে দিতে তৎপর। একদল মানুষ গুলি থেকে বাঁচবার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়েছিল, কেউ বাঁচলো না।দশ মিনিটের নিরবচ্ছিন্ন গুলি চলেছিল সেদিন। খাঁচার মধ্য পুরে যেমন ইঁদুর মারা হয়। ১৬৫০ রাউন্ড। ডায়ারের আক্ষেপ যদি সাঁজোয়াগাড়ি দুটি আনা যেত বা মেশিনগানগুলিকে কাজে লাগানো যেত। ডায়ার পরে রিপোর্টে লিখেছিলেন আমার কর্তব্য ছিল জনতাকে ও পাঞ্জাবের লোকেদের উচিত শিক্ষা দেওয়া। তাই যতটা প্রয়োজন ততটা গুলি চালিয়েছি।হাতে সৈন্য বেশী থাকলে আরও অনেক বেশী খতম করা যেত।

সরকার নিযুক্ত হান্টার কমিটির কাছে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন রাস্তাটা সরু ছিল বলে মেশিনগানগুলো নিয়ে যেতে পারি নি। নাহলে আরও বেশী মানুষকে মারতে পারতাম। এই উক্তিগুলি প্রমাণ করে ডায়ারের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক নরহত্যা, তাই একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে পৈশাচিক উল্লাসে তিনি শতশত নিরীহ শিশু,মহিলা ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেছিলেন।তারপর শহরে কার্ফু জারি করে আহতদের নূন্যতম শুশ্রুষার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বহু অর্ধমৃত মানুষ সেদিন মৃতদেহের গাদার মধ্যে পড়ে ছটফট করছিল। কাদামাখা দেহগুলি বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করেছিল।তৃষ্ণা মেটাতে রক্তকাদামাখা শীতল মাটি চাটতে চাটতে তারা ঢলে পড়েছিল মৃত্যুর কোলে। তবে স্যার মাইকেল ও ডায়ারের ভাষ্য ব্রিটিশ সরকারও মেনে নিতে পারে নি , তাই তাকে কর্মচ্যুত এড়াতে পদত্যাগ করতে হয় এগার মাস পরে।

এদিকে গান্ধিজির প্রস্তাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির নেতৃত্ব দিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ।আব্বাস তায়েবজি,এম আর জয়াকর প্রমূখরাও ছিলেন এই কমিটিতে। জওহরলাল নেহরু এই সময় দেশবন্ধুর সচিব হিসেবে কাজ করেন। কমিটির সদস্যরা বহু প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।সতেরশো মানুষ নির্ভয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। এই হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ, পরাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শহীদতীর্থ।এইখানেই ঐদিন হিন্দু মুসলমান শিখদের রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখানেই রয়েছে ' স্বতন্ত্রতা কি জ্যোতি ' যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিচ্ছিনতাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের অঙ্গীকারকে।

ইংরেজ সরকার এই হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য ওই বাগে একটি কাপড়ের বাজার বসানোর চেষ্টা করে।কিন্তু কংগ্রেসের প্রবল বাঁধায় এই চেষ্টা সফল হয়নি। ১৯১৯ এ অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজির আহ্বানে সিদ্ধান্ত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি সংরক্ষণ করা হবে। জনসাধারণ এই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া দেন। তাৎক্ষণিক ৫.৬৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। ওই টাকা দিয়ে পুরো জালিয়ানওয়ালাবাগ -- এর মালিক হিম্মত সিংহের কাছ থেকে কংগ্রেস কিনে নেয়। স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সভাপতি ও ষষ্ঠীচরণ মুখার্জীকে সম্পাদক করে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। শ্রীমুখার্জি পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হুগলি থেকে অমৃতসরে এসেছিলেন ও ঘটনার দিন জালিয়ানওয়ালাবাগে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার পর এই উদ্যানকে জাতীয় স্মারক বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ সালের ১ মে সংসদে দেশের আইনমন্ত্রী ড. আম্বেদকর জালিয়ানওয়ালাবাগ সংরক্ষণ বিল পেশ করেন ও তা গৃহীত হয়। ১৯৬১ সালের ১৩ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উপস্থিতিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের ইতিহাস যথাযথ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের পর এই শহীদ উদ্যানটি জাতির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন।

একটি বিরল ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতি বছর ১৩ এপ্রিল তারিখটি সারা দেশে জাতীয় শহীদ দিবস রূপে কংগ্রেস পালন করবে। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। এই শহীদ দিবস পালন করতে গিয়ে প্রতি বছর ব্রিটিশ প্রশাসনের বাঁধার সম্মুখীন হতে হত। স্বাধীনতার পর ৭৮ বছর অতিক্রান্ত। এখন আর কোথাও ৩ এপ্রিল দিনটিকে স্মরণ করা হয় না।

১৯৪০ সালে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ব্লকের মাঝিহিরা গ্রামে গান্ধিবাদি স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত গান্ধিজির আদর্শে সর্বদয় আশ্রম ও বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই আশ্রমে সেই থেকে প্রতি বছর ১৩ এপ্রিল তারিখটি শহীদ দিবস রূপে পালিত হয়।

Scanned with OKEN Scanner

শ্রী দাশগুপ্ত ২০১৬ সালে ১০১ বছর বয়সে প্রয়াত হন। কিন্তু ১৩ এপ্রিল শহীদ দিবস উদযাপন বন্ধ হয়নি।

এই বছরেও মাঝিহিরা আশ্রম ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মর্যাদার সঙ্গে এই দিবস পালিত হয়। ১২ এপ্রিল মানবাজার ২ ও ১ নং ব্লকের বারিক ও হুদা এই দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাফাই করা হয়। রোগীদের ফল দেওয়া হয়। মাঝিহিরা গ্রামে সাফাই করা হয়। ১৩ তারিখ সকালে গ্রামে প্রভাতফেরী হয়। আশ্রম প্রাঙ্গণে সাফাইয়ের পর শতাধিক ছাত্র ছাত্রী চরখায় সুতো কাটেন । সন্ধ্যায় আশ্রমের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ডি.এ.মামলা এবং দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে এই মামলার ভূমিকা একটি অনপেক্ষ পর্যালোচনার প্রয়াস

শ্যামল কুমার মিত্র

২০১১সালে সরকারের ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। বাম শাসনের ৩৪ বছরে রাজ্যকর্মীদের একটা বড় অংশ শাসক দলের সঙ্গে থাকার সুবিধাবাদী মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সরকারে শাসকদল পরিবর্তনের পর রাজ্যকর্মীদের একটা বড় অংশ নুতন শাসক দলের সঙ্গে থাকার সেই সুবিধাবাদী মানসিকতাকেই গুরুত্ব দিলেন।

যে শাসকই ক্ষমতায় থাক,সরকার এবং শ্রমিক/কর্মীদের সম্পর্কটা মালিক এবং শ্রমিকের। ফলে কর্মীদেরএকটা বড় অংশ যদি মালিকের স্বার্থে কাজ করার দায় বোধ করেন, ঐক্যবদ্ধ কর্মীপক্ষ তৈরি হয় না। ঐক্যবদ্ধ কর্মীপক্ষের পরিবর্তে বিভাজিত কর্মীপক্ষ দাবি আদায়ের সংগ্রামে দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকার দাবি আদায়ের আন্দোলন ভাঙতে সরকারি সমর্থক কর্মী সংগঠনকে ব্যবহার করে। ২০১১র পর ঠিক এটাই ঘটেছে।

১৯২৩ সাল থেকে (ব্রিটিশ আমল) পুলিশকর্মীদের ইউনিয়ন/ অ্যাসোসিয়েশন করার অধিকার ছিল। বর্তমান সরকার ২০১২ সালের ১০ই জানুয়ারী পুলিশকর্মীদের ইউনিয়ন/ অ্যাসোসিয়েশন করা নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। আমরা বুঝলাম বর্তমান সরকার কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের থেকেও খারাপ। তারপর বেশ কয়েকটি দপ্তরে একই কায়দায় ইউনিয়ন করা নিষিদ্ধ হল। নবান্নসহ গুরুত্বপূর্ন সরকারি ভবনে বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, পোস্টারিংসহ সমস্ত ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হল।

দীর্ঘ লড়াই/সংগ্রামের ফসল হিসাবে যে সব গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অর্জন করেছিলেন কর্মীসমাজ,সে সব একটার পর একটা প্রশাসনিক আদেশে হরণ করা হল। সরকারের কর্মীবিরোধি নীতি ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে সোচ্চার কর্মীদের 'সবক' শেখাতে সুনামির কায়দায় প্রতিহিংসামূলক বদলী (সচিবালয় কর্মীদের ক্ষেত্রে ডিটেলমেন্ট) চলতে থাকল। গোটা প্রশাসনে একটা হাড় হিম করা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করল সরকার ও সরকারপন্থী সংগঠন এবং পদস্থ আধিকারিকদের একাংশ। ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকা ধর্মঘট ভাঙতে বেতন কাটা, সার্ভিস ব্রেকসহ বিবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশনামা প্রকাশ করলেন সরকার। পদোন্নতির ভিত্তি ' সিনিয়রিটি '। তাই 'ব্রেক অফ সার্ভিস ' যে কোনও কর্মীর কাছে যথেষ্ট ভয়ের। এর উপর ধর্মঘটের দিন সকালে সারা রাজ্যে পরিকল্পনা মাফিক প্রচার হল যে নেতারা ধর্মঘট আহ্বান করেছেন,তারাই সকাল সকাল অফিসে এসে হাজিরা খাতায় সই করেছেন। দাবানলের মত এই গোয়েবেলসিয় প্রচার ছড়িয়ে পড়ল।

ফলে ওই ২৮ এ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ব্যর্থ হল।

২০১২ সালের ১৩ ই এপ্রিল সি.এম.ও.(মুখ্যমন্ত্রীর অফিস) আমার এবং আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৩ জন মহিলা অফিসারের শ্লীলতাহানিসহ কুৎসিত অসত্য অভিযোগে,জামিন অযোগ্য ধারায় এফ.আই.আর.(যা মামলা হিসাবে ১০ বছর ধরে চলেছে) করল। স্পষ্টতই সামগ্রিকভাবে কর্মীসমাজে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি এবং জনসমক্ষে আমাদের সামাজিক সম্মানহানির উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পিত উদ্যোগ। আমরা বুঝে যাই, প্রতিবাদ স্তব্ধ করতে এই সরকার যে কোন 'নীচ' কাজ করতে পারে। ১৯৮২ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত আমাদের সংগঠনের মাসিক মুখপত্র 'বাজাও বিষান' এর প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হল প্রশাসনিক ও পুলিশি সন্ত্রাসে। আমরা একক/অন্য সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে একের পর এক কর্মসুচিতে সেভাবে কর্মীসমাগম ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। কর্মীমহলে আতঙ্ক এতটাই প্রবল ছিল।

এই অবস্থায় মূলতঃ ৩ টি কারণে 'কৌশলগত অবস্থান' এর জায়গা থেকে ডি.এ.নিয়ে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম কারণ, আইনি ভাবে এ.আই.সি.পি.আই. অনুসারে ডি.এ.র অধিকার অর্জন। দ্বিতীয় কারণ, সরকার ও শাসক দল এবং কর্মীসমাজের কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌছে দেওয়া যে কর্মীরাও সরকারের কর্মীবিরোধি নীতি ও কর্মসুচির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। তৃতীয় কারণ, অন্তত এই ডি.এ.প্রশ্নে সমস্ত রাজ্যকর্মীদের মধ্যে একটা মানসিক ঐক্য তৈরি করা। ভয় ভাঙানোটা জরুরি ছিল। পূর্বতন বাম সরকার ৫ কিস্তি ডি.এ.র টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে ঢুকিয়ে দেন। তখন স্যাট ছিল না। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। আদালত রায় দেন,যেহেতু ডি.এ.মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বেতন অবক্ষয়ের পরিপূরক হিসাবে দেওয়া হয়,তাই অবসরের সময় বর্তমান ডি.এ.র কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। যে সব কর্মচারী বেতনের সঙ্গে নগদে এই ৫ কিস্তি ডি.এ.পেতে চান,তাদের তা দিতে হবে,তাদের টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে রাখা যাবে না। এর জন্য কর্মীদের থেকে

Scanned with OKEN Scanner

অপশন চাইতে হবে। তৎকালীন সরকার রায় মেনে নেন। এই মামলার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল। সংবিধানের ৩০৯ নম্বর ধারা অধীনে যে কোনও 'রিভিশন অফ পে অ্যান্ড এলাউন্স'(সংক্ষেপে রোপা) সরকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি (constitutional commitment) যা সরকার মেনে চলতে সাংবিধানিক ভাবে বাধ্য। আমরা 'রোপা -২০০৯' বিশ্লেষন করে বুঝলাম বাম সরকার কর্মীদের এ.আই.সি.পি.আই. মেনে ডি.এ.দেওয়ার সংস্থান 'রোপা-২০০৯' এ রেখেছেন। স্বাধীনতার আগে এবং পরে ডি.এ.সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করলাম। পক্ষে/বিপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু রায় পর্যালোচনা করলাম। আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হল মামলার যথেষ্ট ইতিবাচকতা রয়েছে। সংগঠন মামলা করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল একটা শর্তে, সরকার সমর্থক সংগঠন বাদে সব সংগঠনকে নিয়ে একসাথে মামলা করা যাবে। শুরু হল সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা, কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পরও 'ইউনিটি ফোরাম'নামে একটি ছোট সংগঠন ছাড়া কোন সংগঠন মামলায় আগ্রহ দেখালেন না।

আমরা শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী বা অন্যান্য রাজ্য সরকারি সংস্থার কর্মী সংগঠনগুলিকে কোন অনুরোধ জানাই নি, কারন স্যাটে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি কর্মী/সংগঠন মামলা করতে পারে। অবশ্য সে সময়ে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একাধিক পরিচিত শিক্ষক নেতাকে হাইকোর্টে পৃথকভাবে মামলা করার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু কোনও সংগঠন রাজি হননি। আসলে আদালতে কোনও মামলার ফলাফল কি হতে পারে তার আগাম নিশ্চয়তা পাওয়া সম্ভব নয়। ডি.এ.র মত অতি গুরুত্বপূর্ন ও সংবেদনশীল ইস্যুতে আদালতের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিতে অনাগ্রহ ছিল। আমরাও জানতাম মামলার ফল কর্মীদের পক্ষে প্রতিকুল হলে আমরা 'ভিলেন' হয়ে যাব,আমাদের সংগঠনের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়তে পারে। কিন্তু 'ইতিহাস' তৈরির স্বপ্ন দেখলে ঝুঁকি নিতেই হয়। আমরা ঝুঁকি নিয়েছিলাম। এরপর সমস্যা হল কোনও আইনজীবি মামলা নিতে চাইছেন না। আইনজীবি না পেলে মামলা হবে কি ভাবে ? স্যাটের এক জন প্রখ্যাত আইনজীবি আমাদের বেশ কিছু দিন ঘোরালেন । শেষে বললেন,'চাপ আছে। এ মামলা নিতে পারব না।' তিনি পরে রাজ্য সরকারের হয়ে এই মামলায় সওয়াল করেছেন। একজন পরিচিত সিনিয়র সাংবাদিক বার বার আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন,'এ মামলায় সরকার অবশ্যই জিতবে। মামলা করার মত হটকারি সিদ্ধান্তের চরম মূল্য চোকাতে হবে আপনাদের। কর্মীদের কাছে 'ভিলেন' হয়ে যাবেন,বাকি জীবনটা অফিস করতে পারবেন না। আন্দোলন করুন,মামলা নয়।'আমরা বুঝলাম মামলায় সরকারের বিপদ আছে,তাই মামলা না করাতে এই সাংবাদিককে ব্যবহার করছেন।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় সর্দার আমজাদ আলি মামলা নিলেন। আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় SAT এ পিটিশন দাখিল করলেন। শুরু হল 'Confederation Of State Govt. Employees–W.B.& or State Of W.B.& ors' মামলা। ২০১৬ সালে মামলা দায়ের করার সময় 'রোপা-- ২০০৯'এর ৫০% ডি.এ.বকেয়া ছিল। পূর্বতন সরকার ১৬% ডি.এ.র সংস্থান করে রেখে গিয়েছিলেন। তাই বকেয়া ৩৪% ডি.এ.র দাবিতে মামলা। এখনো পর্যন্ত কোন সংগঠন এই ৩৪% বকেয়া ডি.এ.র দাবি তাদের 'দাবিসনদ'এ রাখেন নি।

SAT এর মাননীয় বিচারপতি অসিত তালুকদার ও এ.কে.চন্দ্রের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিলেন,"As it is found by the Tribunal that no one can have any legal right for staking a claim for D.A.–payment of the same being in the sole discretionary realm of the Employer."

SAT এর এই রায়ের পরে কলকাতা হাইকোর্ট কর্মী অনুকুল রায় দেওয়ার মধ্যবর্তী সময় আমরা,আমাদের সংগঠন,আক্ষরিক অর্থে ,কর্মীসমাজে 'ভিলেন' হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। কমবেশি সকলেই বলেছেন,ক্ষয়াও বছরে ১টা ডি.এ. দিচ্ছিল সরকার, আপনাদের হটকারিতায় সেটাও গেল। মামলা করে কর্মীদের বড় ক্ষতি করে দিলেন। 'কটুক্তির বন্যায় আমরা অফিস এবং ইউনিয়ন ঘরের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিলাম। আতঙ্কের সে অধ্যায় আজও আমাদের কাছে এক বিভীষিকা।

এই রায় চ্যালেঞ্জ করে আমরা হাইকোর্টে ২০১৭ সালের ১৪ ই মার্চ সংবিধানের ২২৬ নম্বর ধারায় মামলা করলাম মাননীয় বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও মাননীয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে (W.P.S.T no ৪৫/২০১৭)। দুর্ভাগ্য ,শুনানি শেষ হয়ে রায় দানের সম্ভাবনার মধ্যে অবসর গ্রহণজনিত সময়াভাবের কথা বলে রায় দিলেন না মাননীয় বিচারপতি নিশীথা মাত্রে। তাঁর বেঞ্চ যে ভাবে একের পর এক কর্মী অনুকুল পর্যবেক্ষণ দিয়ে এসেছেন,সরকারকে ১৫% ডি.এ.ঘোষণা করতে বাধ্য করেছেন, তাতে তাঁর বেঞ্চ কেন অপ্রত্যাশিতভাবে রায় দিলেন না , তা আজও আমাদের অজানা।

মামলা গেল মাননীয় বিচারপতি দেবাশিষ করগুপ্ত এবং শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চে। আদালতের নিয়মে আবার শূন্য থেকে মামলা শুরু হল। আগের বেঞ্চের সওয়াল-জবাব, পর্যবেক্ষণ--সব জলে গেল। এই পর্বে আমরা মামলায় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে জন্য একটি সংগঠন/এক জন ব্যক্তি প্রয়োজন। কোন সংগঠন' Add Party' হতে রাজি হলেন না। অবশেষে অর্থ দপ্তরের কর্মী (প্রয়াত) স্বপন দে এগিয়ে এলেন। তাঁর আইনজীবি হিসাবেই বিকাশবাবু, ফিরদৌস শামিম, গোপা বিশ্বাসরা মামলায় আইনজীবী হিসাবে যুক্ত হলেন। তখন সরকার 'বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ফোবিয়া'য় আক্রান্ত। এ.জি.র তীব্র আপত্তিতে আটকে গেল স্বপন দের মামলায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন। ৭ টি শুনানির পর সর্দার আমজাদ আলি ও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের যুক্তি মেনে নিয়ে স্বপন দে কে মামলায় যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন মাননীয় বিচারপতিরা। মামলায় এলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

Scanned with OKEN Scanner

তার পরেরটা ইতিহাস। হাইকোর্টে রিভিউ পিটিশনসহ ৬ টি জয় কর্মীপক্ষের। ৩১ আগষ্ট,২০১৮ মাননীয় বিচারপতি দেবাশীষ করগুপ্ত ও শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিলেন --"D.A.is a legally enforceable right of the employees." পরবর্তীতে মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিলেন,"D.A.is a legally enforceable fundamental right of the employees." এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এস.এল.পি.দাখিল করেছেন রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে আমরা ২ টি গুরুত্বপূর্ন পর্যবেক্ষণ পেয়েছি--'(১)'২০১৮ সালের রায়।সেই রায়ের উপর একই বেঞ্চের কাছে একাধিক রিভিউ পিটিশন দাখিল করে রাজ্য সরকার নিজেই রায়টিকে legality দিয়ে দিয়েছেন। রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোনও চ্যালেঞ্জ মামলা করেন নি। এতদিন পরে কেন এস.এল.পি.? '(২)'কেন রাজ্যের এস.এল.পি.খারিজ করব না? 'স্বাভাবিক ভাবেই মামলার কর্মী অনুকুল রায় সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী। এই মামলা কর্মীদের এখনও পর্যন্ত কি দিয়েছে?

(১) মামলার ছ ছটি কর্মী অনুকুল রায়ে সরকারের অবস্থান দুর্বল হয়েছে,বিপরীতে কর্মীপক্ষ সাহস ফিরে পেয়েছেন।

(২) কলকাতা হাইকোর্টের২০২২ সালের 'বর্ষসেরা'মামলা হিসাবে এই মামলা নির্বাচিত হয়েছে। এটি কর্মীপক্ষের গর্বের বিষয়।

(৩) মাননীয় বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের চাপে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ১৫% ডি.এ. (০১.০১.২০১৮ থেকে কার্যকর) এবং মাননীয় বিচারপতি দেবাশীষ করগুপ্ত ও শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চের চাপে অতিরিক্ত ২৫% (১০% অন্তবর্তী ভাতা তুলে দিয়ে, ০১.০১.২০১৯ থেকে কার্যকর) ডি.এ. ঘোষনা করতে বাধ্য হন। কলকাতা হাইকোর্ট কঠোর অবস্থান নিয়ে এই ৪০% ডি.এ. ঘোষণা করতে রাজ্যকে বাধ্য করেন,অন্যথায় নুতন বেতনক্রম চালুর সময় 'নোশ্যান্যাল' হিসাবেই তা পেতেন রাজ্য কর্মীরা। আদালতের নথিতে এ বক্তব্যের প্রমাণ আছে।

দীর্ঘ ১০ বছরের এই আইনি লড়াইএ অনেক চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার সবগুলি মামলা মেটার পর বিস্তারিত ভাবে জানাব,চমকে ওঠার মত সে সব ঘটনা। দু/একটা উদাহরন দিই। মামলা থেকে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়,সে চক্রান্ত আমরা প্রতিহত করি। মামলা থেকে সর্দার আমজাদ আলিকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের মোকাবিলা আমরা করতে পারি নি। মামলা থেকে তার সরে যাওয়া আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বড় ক্ষতি। রমাপ্রসাদ সরকার নামে হাইকোর্টের এক আইনজীবি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে 'কোন সরকারী কর্মীকে (কেন্দ্র,রাজ্য সব) ডি.এ.দেওয়া জনস্বার্থ বিরোধি এবং তা বন্ধ করতে হবে।'— এই মর্মে একটি জনস্বার্থ মামলা করে। স্বয়ং আমজাদ আলি বলেছিলেন,'রমা বেশ যুক্তি,তথ্য দিয়ে পিটিশনটা করেছে। 'আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখেছি, কোন কেন্দ্রীয়/রাজ্য কর্মী সংগঠন,কোন সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এই মামলার বিরুদ্ধে কোন আইনি অবস্থান নিলেন না। বস্তুত সুপ্রিম কোর্টে যেদিন সরকার পক্ষ লিখিত ভাবে জানালেন,' এই মামলার রায় কার্যকর করতে হলে রাজ্য সরকারকে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের বকেয়া ডি.এ.দিতে ৪১,৫০০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে যা রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব।' তার আগে পর্যন্ত রাজ্য সরকারি কর্মী,শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী, অন্যান্য রাজ্য কর্মীদের কোন সংগঠন এই মামলা সম্পর্কে সম্পূর্ন উদাসীন ছিলেন। বস্তুত ২০২২সালের ১৩ ই এপ্রিল রাজ্য সরকারি কর্মীদের ১ টি মাত্র সংগঠন এই মামলায় যুক্ত হয়েছিলেন। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে রাজ্যকর্মীরা নীতিগত অবস্থানের জায়গা থেকে এই মামলা সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন,কিন্তু কোনও সংগঠন এই মামলা সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। শুধু তাই নয় একাধিক সংগঠন বলে এসেছেন, মামলা করে দাবি আদায় সম্ভব নয়,আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা।

যে কোনও কর্মী সংগঠনের কাছে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের থেকে গৌরবের কিছু হতে পারে না। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াটাও জরুরি। গণতান্ত্রিক সমস্ত পথে আন্দোলন কি কর্মীদের একটিও অপহৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে পেরেছে? নয়া বেতনক্রমে ৪ বছরের বর্ধিত বেতন থেকে রাজ্যকর্মীদের বঞ্চনার অবসান করতে পেরেছি?এই প্রথম তথাকথিত রাজ্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্টটুকুও আমরা আজও দেখার সুযোগ পাইনি। আমরা কি এই রিপোর্ট প্রকাশে সরকারকে বাধ্য করতে পেরেছি?

বর্তমানে ৩৭% ডি.এ.বকেয়া,আন্দোলন কি এই ৩৭% বকেয়া ডি.এ.দিতে সরকারকে বাধ্য করতে পেরেছে? আদালতের নির্দেশে 'রোপা-২০০৯'এর বকেয়া ৪০% ডি.এ. পেয়েছি। দাবি আদায় বাদ দিন,আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী/অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটা বৈঠক করতে পেরেছি? এর জন্য কি যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁরা দায়ি? একেবারেই নয়। তাঁরা রাজ্য সরকারের রোষ সহ্য করে ,ত্যাগ স্বীকার করে আন্তরিকতার সঙ্গে আন্দোলন করেছেন,করছেন। প্রশংসা তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু সরকারে যখন ফ্যাসিস্ত শাসক থাকেন,তখন আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় কঠিন হয়ে পড়ে। তাই'কৌশলগত অবস্থান' হিসাবেই আইনের সাহায্য নিতে হয়। আদালতের ছ ছটি কর্মী অনুকুল রায় যে কর্মীদের 'মুক'থেকে 'মুখর'করে তুলেছে---এ কথা কি অস্বীকার করা যাবে? বাম আমলে দীর্ঘ ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকারি কর্মী,শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য রাজ্য কর্মীদের ২২ টি সংগঠনের 'যৌথ সংগ্রামি মঞ্চ'ধারাবাহিকতার সঙ্গে দীর্ঘ ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে এসেছে পুর্বতন বাম সরকারের বিরুদ্ধে।

সচিবালয় ভিত্তিক একটি সংগঠন শিক্ষক/ শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য রাজ্যকর্মীদের সঙ্গে একসাথে আন্দোলনে স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন না। তাদেরও যৌথ আন্দোলনের বৃত্তে আনার কৌশলে শুধুমাত্র সরকারি কর্মীদের নিয়ে 'মহাকরন সংগ্রাম কমিটি' তৈরি হয়? উভয় মঞ্চ

Scanned with OKEN Scanner

একসাথে আন্দোলনে নামে। সেই আন্দোলনের কয়েকটি মাইলফলকঃ (১)২০০২সালের২৭সেপ্টেম্বর সর্বাত্মক 'কলম ধর্মঘট'। (২)২০০৬ সালের ২৯ আগষ্ট 'মহাকরনে গণঅবস্থান'যে অবস্থানকে আনন্দবাজার 'মহাকরনে নুতন অলিন্দযুদ্ধ'নামে সংবাদ করেছিল। (৩)২০০৯ সালের ৪ ঠা জানুয়ারি 'মহাকরনে সর্বাত্মক ধর্মঘট'। (৪)২০০৯সালের ২২জানুয়ারি সারা 'রাজ্যে সমস্ত রাজ্যকর্মীদের ধর্মঘট'। এই ধর্মঘট এতটাই সফল ও সর্বাত্মক হয়েছিল যে সংবাদ মাধ্যম লিখেছিল,এই প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধি কর্মী সংগঠনের ডাকা ধর্মঘট সর্বাত্মক ও সফল হল। ধর্মঘটের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে সরকার ৬ মাসের মধ্যে পে-কমিশন গঠন করে নয়া বেতনক্রম কার্যকর করতে বাধ্য হয়। আমার দীর্ঘ ৪ দশকের ট্রেড ইউনিয়ন অভিজ্ঞতায় দাবি আদায়ে এত সফল ধর্মঘট দেখি নি।

এই 'যৌথ সংগ্রামি মঞ্চ' এর নামে একটু অদল বদল করে বর্তমান মঞ্চের নামকরণ হল 'সংগ্রামি যৌথ মঞ্চ'। নামকরণটা কি অতীত গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্যে? কলকাতা হাইকোর্টের রায় ৩,১৯,০০০ কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য কার্যকর করতে হবে--- এই তথ্য দেওয়ার পর শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য রাজ্যকর্মীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারেন,রাজ্য শুধু রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য রায় কার্যকর করবেন বলে স্থির করেছেন। এই আতঙ্কের জায়গা থেকেই মূলত শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী সংগঠন গুলির একাংশের উদ্যোগে 'সংগ্রামি যৌথ মঞ্চ'এর জন্ম এবং আন্দোলন। ২০১১র পরে ডি.এ.র প্রশ্নে কোন উল্লেখযোগ্য যৌথ আন্দোলন হয়েছে,এমন তথ্য নেই। সংগঠনগুলি নিজেদের মত করে আন্দোলন করে এসেছেন। বর্তমান মঞ্চে আমাদের সংগঠন যুক্ত হয় নি।

এই মঞ্চের নেতৃত্ব বরাবর বলে এসেছেন,বর্তমান আন্দোলন 'রোপা-২০১৯' এর ডি.এ.র দাবিতে,মামলার সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন যোগ নেই। তারা মামলায় যুক্ত হওয়ার কথা ভাবছেন না। এ কথা সত্যি যে টানা১৪ বার মামলার শুনানি হয় নি।' তারিখ পে তারিখ' সংস্কৃতির খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল মামলা। কিন্তু এক্ষেত্রে মামলাকারী সংগঠনের আদৌ কোন'দায়'আছে?প্রচার হল অভিষেক মনু সিংভীর হাতযশে এ ভাবে তারিখের পর তারিখ পড়ছে। এ রাজ্যে আদালত নির্দেশিত কেন্দ্রীয় এজেন্সীর তদন্তের বাইরেও ,রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া কেন্দ্রীয় এজেন্সী বহু বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে তদন্ত করছে রাজ্যকে বিব্রত করার রাজনৈতিক লক্ষ্যে। ----এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে রাজ্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সীর তদন্তের সুনামিতে এই মামলা রাজ্য সরকার ও তৃণমূল দলের কাছে ডি.এ.মামলার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ডি.এ.মামলায় ১ জন 'অভিষেক মনু সিংভি'আছেন সরকারের পক্ষে। কিন্তু পূর্বোক্ত মামলায় রাজ্য অনেক'অভিষেক মনু সিংভি'কে নিয়োগ করেছেন।

তার পরেও গত সাড়ে ৩ বছরে ২৫ বার তারিখ পেয়েছে এই মামলা। এমন আরো মামলার উদাহরণ আছে। সুপ্রিম কোর্ট চলে সুপ্রিম কোর্টের নিয়মে। পুর্বতন বিচারপতি ডি.এ.মামলা শুনবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,তাই শুনানি হয় নি,বর্তমান বেঞ্চ মামলা শুনতে চাইছেন,তাই শুনানি হবে বলে আশ্বাস পাওয়া গেছে। তাই মামলায় শুনানি না হওয়ার 'দায়' মামলাকারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অজ্ঞানতা প্রসুত,অথবা উদ্দেশ্য প্রনোদিত,কর্মীদের চোখে মামলাকারীদের 'অযোগ্য' প্রতিভাত করার প্রয়াস।

সংগ্রামি যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক সম্মানীয় ভাস্কর ঘোষের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে রয়েছে, যে ভিডিওতে উনি বলছেন,'ডি.এ.মামলার সঙ্গে যুক্ত একটি সংগঠনকে আমরা ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম মামলায় ভাল আইনজীবি দাঁড় করানোর জন্য, তারা টাকা নিয়েও আইনজীবী নিয়োগ করেননি।' ভয়ঙ্কর অভিযোগ। মামলার সঙ্গে যুক্ত ৩ টি সংগঠন। উনি টাকা দিয়েছেন,যদি সত্যিই দিয়ে থাকেন,তাহলে উনি যে সংগঠনকে টাকা দিয়েছেন,সেই সংগঠন এবং ভাস্করবাবু জানেন সংগঠনটির নাম কি?উনি সেই নির্দিষ্ট সংগঠনের(যদি আদৌ দিয়ে থাকেন) নাম জানেন। তাহলে সেই সংগঠনের নাম না বলে ৩ টি সংগঠনকেই এই 'ভয়ঙ্কর অভিযোগ'এ কর্মীমহলে সন্দেহভাজন করে তুললেন কোন উদ্দেশ্যে? আমাদের সংগঠন' কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ,প.ব.'কে উনি ১০,০০০ টাকার একটি চেক দিয়েছিলেন। ১০,০০০টাকার অনুদান নিয়ে ২০ লক্ষ টাকা পাওয়ার সন্দেহভাজন কেন আমাদের করবেন উনি?ওনার সৎসাহস থাকলে উনি বলুন কোন সংগঠনকে উনি তথাকথিত ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন,বাকিদের 'কলঙ্কিত 'করার চেষ্টা করছেন কেন? যদি সত্যিই কোন সংগঠনকে ২০লক্ষ টাকা উনি দিয়ে থাকেন,তাহলে সেই সংগঠনের নাম বলতে অসুবিধা কোথায়?বহু কর্মীবন্ধু আমাদের বলেছেন,২০লক্ষ টাকা পাওয়ার পরও অনুদান চাইছেন কেন? কেন এভাবে আমাদের বিব্রত করার প্রয়াস?

উনি বলছেন কোন মামলায় উনি হারেন না। এতটাই যখন আত্মবিশ্বাস,তখন 'রোপা---২০১৯' এ ডি.এ.র অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মামলা করছেন না কেন?' রোপা---২০১৯'এ 'ডি.এ.' শব্দটাই নেই। ফলে এই মুহুর্তে 'ডি.এ.'আমাদের 'অধিকার' নয়। ডি.এ.মামলার সঙ্গে যুক্ত ৩ টি সংগঠন ডি.এ.নিয়ে দ্বিতীয় কোন মামলা করতে পারবেন না, বর্তমান মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত। ততদিনে 'রোপা---২০১৯'কে চ্যালেঞ্জ করার সময় অতিক্রম করতেই পারে। এই মুহুর্তে সব থেকে জরুরি 'রোপা---২০১৯'কে চ্যালেন্জ করে তাতে' ডি.এ. র অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মামলা করা। সেই 'দায়িত্ব'টা উনি নিতেই পারতেন, কেন নেন নি?

আসলে দীর্ঘ ১০ বছরের আইনি লড়াইএ শেষ মুহুর্তে' মেড বাই সংগ্রামি যৌথ মঞ্চ' ছাপ মেরে দেওয়ার কাজটা যতটা সহজ,ঠিক ততটাই কঠিন আইনি লড়াই এর মাধ্যমে 'রোপা---২০১৯'এ 'ডি.এ.'র 'অধিকার' প্রতিষ্ঠা করার কাজ। ১৫ জুলাই,২০২৪ সুপ্রিম

Scanned with OKEN Scanner

কোর্টে আবার একটা তারিখ পাওয়া গেল'৭ ই জানুয়ারি,২০২৫'। ১৬ই জুলাই ভাস্করবাবু একটা ভিডিওতে বললেন,' ৭ ই জানুয়ারি থেকে আমরা মামলার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি। হরিশ সালভে মঞ্চের হয়ে সওয়াল করবেন, মামলা আমরা বার করে আনব। '৩ সংগঠন মামলার সঙ্গে যুক্ত,তাদের মামলার 'দায়িত্ব'অন্য কেউ নিয়ে নিতে পারেন? ৭ই জানুয়ারি আমরা কোন হরিশ সালভেজীকে মামলায় পাই নি। ২৫ মার্চ,২০২৫ মঞ্চের পক্ষ থেকে মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন করা হল।

গত ০৭.০২.২০২৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে S.L.P.no7864 of ২০২৪ মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের সার্কুলার নম্বরঃ F.no.9/judi/2025 dt.২০.০২.২০২৫ অনুসারে S.L.P.öi"þ respondent নন, এমন ব্যক্তি/সংগঠন/মঞ্চের মামলায় যুক্ত হওয়া কঠিন। গত ২৫ মার্চ আমাদের মামলার শুনানির দিন ২৮ নম্বর সিরিয়ালে থাকা মামলায় এ বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিলেন,"We will not allow any intervention applications–but may be allowed to argue and assist the Court." আমাদের আইজীবিরা বলেছিলেন, 'এই বেঞ্চ ২৮ নম্বর সিরিয়ালের মামলায় যে নির্দেশ দিয়েছেন, ৪৪ নম্বর সিরিয়ালেব . (ডি.এ.মামলা) মামলাতেও একই নির্দেশ দেবেন (বাস্তবে সেটাই হয়েছে)। মঞ্চের সংযুক্তির আবেদনের বিরোধিতা করে অযথা সমালোচনা আহ্বান করবেন কেন? 'আমরা বলেছিলাম আমরা আমাদের আপত্তি রেকর্ড করতে চাই। কেন আমরা এই আপত্তি রেকর্ড করালাম? আমরা নিশ্চিত ছিলাম সরকার এই' Intervention application'এর বিরোধিতা করবেন না। কারণ ১ টা 'Intervention application' allowed হলে,সরকার একের পর এক ব্যক্তি/সংগঠনকে দিয়ে 'Intervention application' করাবে,যাতে মামলাটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা যায়।

তাছাড়া মামলাটা স্যাটের,তাই অন্য জটিলতার আশঙ্খাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তিম পর্বে এসে মামলায় কোন দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান রেকর্ড করার প্রয়োজন ছিল। আমরা কিন্তু মঞ্চের আইনজীবির সওয়ালের কোন বিরোধিতা করি নি। আমরা স্যাটে আমাদের পিটিশনে তাদের জন্য ডি.এ.চেয়েছিলাম,যাদের বেতনক্রম 'রোপা---২০০৯' অনুসারে সংশোধিত হয়েছে। ফলে রাজ্য সরকারি কর্মী, শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী, অন্যান্য রাজ্যকর্মী সকলেই এই রায়ের আওতায় এসে যাচ্ছেন। এর পরও রাজ্য সরকার শুধু সরকারি কর্মীদের জন্য রায় লাগু করেন,তখন শিক্ষক/ শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য রাজ্যকর্মীদের জন্য হাইকোর্টে মামলা হবে। যেহেতু সকলেই একই হারে একই সময় থেকে ডি.এ.পান,তাই সহজেই সকলের জন্য অর্ডার করতে হবে সরকারকে।

আমরা রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য যতটা' দায়বদ্ধ',ঠিক ততটাই' দায়বদ্ধ' শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য রাজ্যকর্মীদের প্রতি। যদি ২০১৬ সালে হাইকোর্টে পৃথকভাবে একই ইস্যুতে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য রাজ্যকর্মী সংগঠনগুলি মামলা করতেন,তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কোন অনিশ্চয়তা থাকত না। এ কথা সত্য, সে সময়ে রাজ্য সরকারি সংগঠনের মত দূরদৃষ্টি প্রদর্শনে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী/অন্যান্য রাজ্যকর্মী সংগঠন ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্যাটে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি সংগঠনই মামলা করতে পারেন।

জুন,২০১১ থেকে জুলাই,২০২৪ পর্যন্ত কর্মীদের ডি.এ.না দিয়ে রাজ্য সরকার ২,১৯,১০৭.২৫ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন। জানুয়ারি,২০১৯ এ এই সাশ্রয় যখন ৯৭,২২৫ কোটি টাকা,তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মহার্ঘভাতা বনাম উন্নয়ন' শীর্ষক নিবন্ধে অভিরুপ সরকার বলেছিলেন,'কর্মীদের ডি.এ.না দিয়ে রাজ্য যে ৯৭,২২৫ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন,তা রাজ্যের উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থে রাজ্য কর্মীরা এ টুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই পারেন।' রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রীও একই কথা বলছেন। দুটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন----(১) রাজ্যকর্মীদের ডি.এ.র টাকা অন্য খাতে খরচ করার অধিকার সরকারকে কে দিল? (২) রাজ্যকর্মীদের ডি.এ.র টাকায় রাজ্যের উন্নয়ন হলে মুখ্যমন্ত্রী তার কৃতিত্ব দাবি করেন কেন? রাজ্য সরকার ২০১৬--১৭ থেকে ২০২০--২১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৫ বছরে রাজনৈতিক নেতা/নেত্রী (বর্তমানে সবই শাসক দলের) পরিচালিত এন.জি.ও.গুলিকে ১,০৬,৮১৭ কোটি টাকা এবং 'অন্যান্য'বর্নিত খাতে ১০,৮৫৯ কোটি টাকা (সর্বমোট ১,১৭,৬৭৬ কোটি টাকা) অনুদান দিয়েছেন(তথ্যসূত্রঃ সি.এ.জি.রিপোর্ট)। এন.জি.ও.গুলি রাজ্য/কেন্দ্রীয়/সি.এ.জি.অডিটের আওতার বাইরে। সরকারের এ কথা জানার 'আইনি অধিকার' নেই যে অনুদানের অর্থ কোন খাতে খরচ করেছে সংশ্লিষ্ট এন.জি.ও.। অর্থাৎ এই ১,১৭,৬৭৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকার তৃণমূল নেতা/নেত্রীদের দান করেছেন। সেই সরকার ডি.এ.মামলার রায় কার্যকর করতে ৪১,৫০০ কোটি টাকার সংস্থান করতে পারেন না-- এ কথা বিশ্বাসযোগ্য?

২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রাজ্যকর্মীদের বেতন ও পেনশন খাতে ২৫,২৬২ কোটি টাকা সরকার খরচ করেননি (তথ্যসূত্র- রাজ্য অর্থ দপ্তর) এবং সংশ্লিষ্ট খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের ৯,০০০ কোটি টাকা রাজ্য খরচ করে নি। অর্থাৎ রাজকোষে বেতন ও পেনশন খাতে ৩৪,২৬২ কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেননি।

(লেখক, সভাপতি , কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ,প.ব)

মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্ট

১৮, বিমল সিংহরোড,বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ

প্রেস বিবৃতি : গতকাল ১১ এপ্রিল জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফ্ (WAQF) সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে এস.ডি.পি.আই, ডব্লুউ.পি.আই , ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সংগঠন এবং তৃণমূল কংগ্রেস

Scanned with OKEN Scanner

এই জমায়েতে ইন্ধন যোগায়। সুতি-২ নম্বর ব্লক-এর সাজুর মোড়ে এবং সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়। আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেরকম সদর্থক কোন ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। পুলিশ প্রশাসন সঠিক ভূমিকা পালন করলে এই ধরণের ঘটনা হয়ত ঘটত না। কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ প্রশাসন। দীর্ঘক্ষণ আন্দোলন চলার পর শেষের দিকে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। পুলিশের পক্ষ থেকে গুলি ছোড়ে বলেও শোনা যায়। সেই গুলিতে কয়েকজন জখম হয়েছে বলে জানা যায়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ইজাজ সেখ নামে একজন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয় এবং আজ মারা গেছে। আজ দুপুরে ধুলিয়ানের জাফরাবাদ এলাকার একই পরিবারের ২ জন হরগোবিন্দ দাস (গাজল) ও চন্দন দাস মারা গেছে। এরা দুজনেই সি.পি.আই (এম) সমর্থক ছিলেন। জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

আজ সকালে ধুলিয়ান বাজারে পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপি'র নেতৃত্বে একটা মিছিল বের হয়। আগেরদিন ঐ ধরণের ঘটনার পর কেন মিছিলের অনুমতি দেওয়া হল? ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামশেরগঞ্জ ব্লকের পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে রেষারেষি বাড়তে থাকে। দীর্ঘক্ষণ চলার পরেও প্রশাসনের ভূমিকা ভালো ছিল না। প্রথম দিনের শেষের দিকে বিএসএফ-কে নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে কিন্তু আজ সকাল থেকে কোন অজ্ঞাত কারণে বিএসএফ ছিল না, প্রশ্ন জাগছে সবার মধ্যে। প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিজেপি-তৃণমূলের বাইনারি রাজনীতির সুযোগ করে দিতেই প্রশাসন নীরব থেকেছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের অপদার্থতার কারণে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ার কারণে বিপদে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ইস্যুতে আন্দোলনকে চাপা দিতেই বিভাজনের রাজনীতিতে মেতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমরাও শুরু থেকেই ওয়াকফ্ (WAQF) সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি নিয়ম মেনে।

তাই, আমরা মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানাতে চাই

১) এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে সামশেরগঞ্জ ও সুতি-২ ব্লকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

২) এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দলমত, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রীতি রক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

৩) অবিলম্বে জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে জেলা প্রশাসনকে জেলাস্তরে এবং প্রতিটি ব্লকস্তরে দ্রুত সর্বদলীয় সভা ডাকতে হবে।

৪) এই ঘটনায় মৃত ৩ জনের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ধন্যবাদসহ

জামির মোল্লা

আহ্বায়ক, মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্ট কমিটি

১২ এপ্রিল ২০২৫

Scanned with OKEN Scanner